

পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ

# আমাৰ বাংলা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়







## লেখক পরিচিতি

**সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) :** জন্ম নদিয়ার কৃষ্ণনগরে। অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহির নওগাঁয় যাওয়ার আগে পর্যন্ত সুভাষের শৈশব কেটেছিল কলকাতায়, ৫০ নম্বর নেবুতলার গালিতে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আবার কলকাতায় ফিরে মেজোকাকার বাসায়, বাঞ্ছারাম অকুর লেনে আশ্রয় নিলেন। ভরতি হলেন ক্লাস ফাইভে। মেট্রোপলিটন স্কুলে, বটবাজার শাখায়।

বিশ শতকের তিনের দশকে দুনিয়া জুড়ে দেখা দিয়েছিল ভয়ংকর অথনেতিক সংকট। তার বাপটা লাগে তাঁদের পরিবারেও। বটবাজার থেকে তাদের উঠে আসতে হয় দক্ষিণের শহরতলিতে। সুভাষকে ভরতি হতে হয় সত্যভামা ইনসিটিউশনে, সপ্তম শ্রেণিতে। এরপর নবম শ্রেণিতে ভবানীপুর মির্ঝ ইনসিটিউশনে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আশুতোষ কলেজে ও স্কটিশচার্চ কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত করেন। পরে দর্শন নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ-তে ভরতি হলেও তুমুল রাজনৈতিক ব্যস্তায় সুভাষের এম এ পরীক্ষা আর দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

সত্যভামা ইনসিটিউশনের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালীন স্কুল-ম্যাগাজিন ফল্জু-তে ছাপা ‘কথিকা’-ই, তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা। সুভাষের কবিসভার প্রকৃত বিকাশ ঘটে বৃদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’ পত্রিকায়। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ‘কবিতাভবন’ থেকে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘পদাতিক’ প্রকাশিত হয়।

১৯৪৮-এ প্রকাশিত হয় সুভাষের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘আঁশিকোণ’। ১৯৫০-এ বেরোয় ‘চিরকৃত’। ‘হাংরাস’ তাঁর প্রথম উপন্যাস, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। পাঁচ ও ছয়ের দশকে একের পর এক প্রকাশিত হয় নাজিম হিকমতের কবিতার বাংলা অনুবাদ, অনুদিত উপন্যাস কত ক্ষুধা; রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ; অক্ষরে অক্ষরে; কথার কথা; দেশবিদেশের বৃপকথা; ছোটোদের জন্য সংক্ষেপিত বাঙালির ইতিহাস; ভূতের ব্যাগার; যত দূরেই যাই; কাল মধুমাস; যথন যেখানে; ডাকবাংলার ডায়েরি; নারদের ডায়ারি; বেতে বেতে দেখা; বুশ গঞ্জ সঞ্চয়ন। সর্বোপরি ১৯৬১ থেকে ১৯৬৩ – তিনি বছর সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে যৌথভাবে ছোটোদের বিখ্যাত সন্দেশ পত্রিকার নবপর্যায়ের সম্পাদনাও। ১৯৬৪-তে তিনি ‘যত দূরেই যাই’ কাব্যগ্রন্থের জন্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। ছয়ের দশক থেকেই তিনি সংযুক্ত থাকেন ‘আফ্রো-এশিয়ান রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন’-এর বিভিন্ন রকম কাজে। এই সুত্রে পরিচিত হন বিশ্বের খ্যাতনামা কবি ও লেখকদের সঙ্গে। ১৯৭৭-এ অ্যাফ্রো-এশিয়ান রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের ‘লোটাস’ পুরস্কারে সম্মানিত হন। সাতের দশকে এই ভাই; ছেলে গেছে বনে; একটু পা চালিয়ে ভাই কাব্য-গ্রন্থ ছাড়াও প্রকাশিত হয় স্মরণীয় উপন্যাস হ্যাংরাস; কে কোথায় যায়। পরের দুই দশকে উল্লেখযোগ্য বই-এর মধ্যে রয়েছে, ধর্মের কল; ফুল ফুটুক; পাবলো নেবুদার আরও কবিতা; হাফিজের কবিতা; অমুর শতক; গাথা সংপ্রশ্রী অনুবাদ কাব্য, অন্তরীপ বা হানসনের অসুখ; কাঁচা-পাকা; কমরেড; কথা কও উপন্যাস; আবার ডাকবাংলার ডাকে; ঢেলগোবিন্দের আত্মদর্শন; ঢেলগোবিন্দের মনে ছিল এই; টানাপোড়েনের মাঝখানে; কবিতার বোঝাপড়া প্রবন্ধগ্রন্থ। ছোটোদের জন্য তাঁর ছড়ার বই ‘মিঁড়িয়ের জন্য ছড়ানো ছিটনো’।

পরবর্তীকালের কাব্যগ্রন্থগুলি হলো ‘যা রে কাগজের নৌকা’; ‘ধর্মের কল’; ‘ছড়ানো ঘুঁটি’ প্রভৃতি। ১৯৮৮ সালে তিনি ‘কবির পুরস্কার’ লাভ করেন।

কাশ্মীরের ছেলে  
জলিমোহন কল-কে



**সূচি পত্র**

ভূমিকা	৭৩
* গারো পাহাড়ের নীচে	৭৪
* ছাতির বদলে হাতি	৭৭
দীপঙ্করের দেশে	৮০
বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ	৭৮
শাল-মহুয়ার ছায়ায়	৯২
পাতালপুরীর রাজ্য	১০০
* কলের কলকাতা	১০৫
জগদ্দল পাথর	১১৮
ঢাটগাঁয়ের কবিওয়ালা	১২৩
* মেঘের গায়ে জেলখানা	১২৯
* হাত বাড়াও	১৩৬

## ভূমিকা

বেশ ছিল।

শেয়ালদায় যাও। টিকিট কাটো। তারপর বেরিয়ে পড়ো উত্তরে কি পুবে—যখন যেখানে মন চায়। ভেড়ামারা পার হয়ে সাড়ার পুল। নীচে তাকিয়ে মনে হবে পদ্মার চেউগুলো যেন লাফিয়ে লাফিয়ে গিলতে আসছে। কিংবা যাও গোয়ালন্দে। ভাজা ইলিশের গন্ধ স্টিমারঘাট অব্দি পেছনে ডাকতে ডাকতে যাবে।

আজ জলেস্থলে গান্ধি আঁকা। সে গান্ধি পার হবার হুকুম নেই।

দিন বদলেছে।

শালগাছের ছায়ায় ছায়ায় আজ আর গোরা পল্টনের তাঁবু নেই। খালের দুপাশে চিক চিক করে না মানুষের হাড়। লরির রাস্তায় এখন পাতন হচ্ছে নতুন নতুন গঞ্জ। সাধীন দেশে মানুষ এখন নতুন করে দল বাঁধছে, নতুন করে শপথ নিচ্ছে, নতুন করে স্বপ্ন দেখছে সুখশাস্ত্র।

শীতের হাওয়া দিলে আজও দাফা-র কথা মনে পড়ে। মাটির ঘরে কাঁথা গায়ে দিয়ে কাঁপছি। কপাটহীন জানালা-দরজা দিয়ে দেখছি জ্যোৎস্না গায়ে মেখে দূরে দাঁড়িয়ে আছে গারো পাহাড়। আমি তঙ্কাপোষে আর দাফা মেরোতে। ঠান্ডায় দুজনেরই চোখে ঘুম নেই।

তিন কুলে কেউ ছিল না তার। কোথায় ছিল তার ঘরবাড়ি, কে ছিল তার মা-বাবা—কিছুই জানে না দাফা। ছেলেবেলায় সে ছিল গোরুচোর। সারা গায়ে তার মারের দাগ। দাফা বদলে গেল ললিতের বাড়িতে এসে। ললিতই তাকে রাস্তা থেকে ধরে এনেছিল। দাফাকে দেওয়া হলো গোরুর রাখালি। ললিতের বড়কে দাফা মা বলে ডাকল। দাফা হয়ে গেল ললিতের ছেলের মতো। দাফাকে সবাই হাবাগোবা বলেই জানত। সেই দাফা পড়তে শিখল। সামিতির বাস্তা নিয়ে প্রচারে যাওয়া, হাটে হ্যান্ডবিল বিলি করা, চোঙা ফোকা—সব কাজেই দাফা-র ডাক পড়ে।

তার খুব ইচ্ছে একবার শহরে যাওয়ার। রেলগাড়ি কখনও সে দেখেনি। শহরে নাকি খুব আলো?

কলকাতায় ফিরে এলাম। তারপর কটা বছর কাটাকাটি ভাগাভাগি—কী আতান্তরেই না কেটেছে।

হঠাৎ একদিন শুনলাম বুকে গুলি লেগে দাফা মারা গেছে। লড়েছিল খুব জোর। কিন্তু বন্দুকের সঙ্গে পারেনি। দাফা মরতে চায়নি, চেরেছিল মানুষের মতো মাথা উঁচু করে বাঁচতে।

‘শহরে নাকি খুব আলো?’—এখনও কানে বাজছে।

শুধু কি দাফা? শুধু কি সেই পাহাড়তলী? সারা বাংলাদেশই সেদিন এমনি ছিল।

সেই এক-যে ছিল বাংলাদেশে যা দেখেছি যা শুনেছি তাই নিয়ে ‘আমার বাংলা’। বন্ধু দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ‘রংমশালে’ জোর করে না লেখালে কোনোদিনই হয়তো এ বই লেখা হতো না। এ বই পড়ে লোকের ভালো লাগবে কে জানত?



## গারো পাহাড়ের নীচে

চৈত্র মাসে যদি কখনও মৈমনসিং ঘাও, রান্তিরে উত্তর শিয়রে তাকাবে। দেখবে যেন একরাশ ধোঁয়াটে  
মেঘে কারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ভয় পাবার কিছু নেই; আসলে ওটা মেঘ নয়, গারো পাহাড়।

গারো পাহাড়ে যারা থাকে, বছরের এই সময়টা তারা চাষবাস করে। তাদের হাল নেই, বলদ নেই— তাছাড়া  
পাহাড়ের ওপর তো শুধু গাছ আর পাথর। মাটি কোথায় যে চাষ করবে?

তবু তারা ফসল ফলায়—নইলে সারা বছর কী খেয়ে বাঁচবে? তাই বছরে এমনি সময় শুকনো ঝোপে বাড়ে  
তারা আগুন লাগিয়ে দেয়। সে কি যে-সে আগুন? যেন রাবণের চিতা—জ্বলছে তো জ্বলছেই। বছরের এমনি  
সময় যেন বনজঙ্গলের গাছপালারাও ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে।

জঙ্গলে যখন আগুন লাগে তখন হয় মজা। বনের যত দুর্ধর্ঘ জানোয়ার প্রাণ নিয়ে পালাই-পালাই করে।  
বাঘ-অজগর, হরিণ-শুয়োর যে যেদিকে পারে ছোটে। আর পাহাড়ি মেয়ে-পুরুষরা সেই সুযোগে মনের সুখে  
হরিণ আর শুয়োর মারে। তারপর সন্ধেবেলা শিকার সেরে গোল হয়ে ঘিরে নাচ আর গান।

এদিকে আস্তে আস্তে গোটা বন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পাথরের ওপর পুরু হয়ে পড়ে কালো ছাইয়ের পলেস্তারা,  
তার ওপর বীজ ছড়াতে যা সময়। দেখতে দেখতে সেই পোড়া জমির ওপর সবুজ রং ধরে—মাথা চাড়া দেয়  
ধান, তামাক, আর কত ফসল।

আমরা এই লোকগুলোর এক কাছে থেকেও পর; শুধু জানি, উত্তর দিকের আকাশটা বছরের শেষে একবার দপ্ত করে জলে ওঠে—দূরের আশ্চর্য মানুষগুলো তারপর কখন যে মেঘের রঙে মিলিয়ে যায় তার খবর রাখি না।

কাছাকাছি গিয়েছিলাম একবার।

গারো পাহাড়ের ঠিক নীচেই সুসং পরগনা। রেললাইন থেকে অনেকটা দূরে। গাড়ি যাবার যে রাস্তা, সে-রাস্তায় যদি কখনও যাও কান্না পাবে। তার চেয়ে হেঁটে যেতে অনেক আরাম।

সুসং শহরের গা দিয়ে গেছে সোমেশ্বর নদী। শীতকালে দেখতে ভারি শান্তশিষ্ট—কোথাও কোথাও মনে হবে হেঁটেই পার হই। কিন্তু যেই জলে পা দিয়েছি, অমনি মনে হবে যেন পায়ে দড়ি দিয়ে কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। শ্রোত তো নয়, যেন কুমিরের দাঁত। পাহাড়ি নদী সোমেশ্বরী—সর্বদা যেন রেগে টং হয়ে আছে!

তার চেয়ে ফেরি আছে, গোরু-ঘোড়া-মানুষ একসঙ্গে দিব্যি আরামে পার হও। হিন্দুস্থানি মাঝির মেজাজ যদি ভালো থাকে, তোমার কাছ থেকে দেশবিদেশের হালচাল জেনে নেবে। হয়তো গর্ব করে বলবে, তার যে বিহারি মনিব, বাংলার সব ফেরিঘাটেরই সে মালিক।

পাহাড়ের নীচে যারা থাকে, তারা আমাদেরই মতো হালবলদ নিয়ে চাষ-আবাদ করে। মুখচোখে তাদের পাহাড়ি ছাপ। হাজং-গারো-কোচ-বানাই-ডালু-মার্গান এমনি সব নানা ধরনের জাত। গারোদের আলাদা ভাষা; হাজং-ডালুদের ভাষা যদিও বাংলা, কিন্তু তাদের উচ্চারণ আমাদের কানে একটু অস্তুত ঠেকে। ‘ত’-কে তারা ‘ট’ বলে, ‘ট’-কে ‘ত’; আবার ‘ড’-কে তারা ‘দ’ বলে, ‘দ’-কে ‘ড’। প্রথম শুনলে ভারি হাসি পাবে। ভাবো তো, তোমার কাকার বয়সের একজন হৃষ্টপুষ্ট লোক দুধকে ডুড বলছে, তামাককে টামাক।

এ-অঞ্জলের গারোদের ঘর দূর থেকে দেখলেই চেনা যায়। মাচা করে ঘর বাঁধা। মাচার ওপরে যেখানেই শোয়া, সেখানেই রান্নাবান্না সবকিছু। হাঁসমুরগি ও এই উচ্চাসনেই থাকে। এটা হচ্ছে পাহাড়ি স্বভাব। বুনো জস্তুজানোয়ারের ভয়েই এই ব্যবস্থা।

এই অঞ্জলের হাজংরাই সংখ্যায় সব চেয়ে বেশি। ‘হাজং’ কথার মানে নাকি ‘পোকা’। তাদের মতে, পাহাড়তলীর এই অঞ্জলে হাজংরাই প্রথম আসে; আর তখন চায়বাসে তাদের জুড়ি নাকি আর কেউ ছিল না। পাহাড়ি গারোরা তাই তারিফ করে তাদের নাম দিয়েছে হাজং-অর্থাৎ চায়ের পোকা।

ধানের ক্ষেত দেখলে কথাটা বিশ্বাস না করে উপায় নেই। একটু কষ্ট করে যদি পাহাড়ে না হোক একটা টিলার ওপরেও ওঠো—নীচের দিকে তাকালে দেখবে পৃথিবীটা সবুজ। যতদূর দেখা যায় শুধু ধান আর ধান— একটা সীমাহীন নীল সমুদ্র যেন আহ্বাদে হঠাত সবুজ হয়ে গেছে।

এত ফসল, এত প্রাচুর্য—তবু কিন্তু মানুষগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় জীবনে তাদের শান্তি নেই। একটা দুষ্ট শনি কোথাও কোন্ আনাচে যেন লুকিয়ে আছে। ধান কাটার সময় বাড়ির মেয়ে-পুরুষ সবাই কাস্তে নিয়ে মাঠে ছুটবে; পিঠে আঁটি-বাঁধা ধান নিয়ে ছোটো ছোটো ছেলের দল কুঁজে হয়ে খামারে জুটবে। কিন্তু মাঠ থেকে যা তোলে, তার সবটা ঘরে থাকে না। পাওনাগন্ডা আদায় করতে আসে জমিদারের পাইক-বরকন্দাজ। সে এক মজার ধাঁধা তখন তারা গালে হাত দিয়ে যেন বলে:

বড়েই ধাঁধায় পড়েছি, মিতে—  
 ছেলেবেলা থেকে রয়েছি গ্রামে;  
 বারবার ধান বুনে জমিতে  
 মনে ভাবি বাঁচা যাবে আরামে।  
 মাঠ ভরে যেই পাকা ফসলে  
 সুখে ধরি গান ছেলেবুড়োতে।  
 একদা কাস্তে নিই সকলে।  
 লাঠির আগায় পাড়া জুড়োতে  
 তারপর পালে আসে পেয়াদা  
 খালি পেটে তাই লাগছে ধাঁধা॥

গাঁয়ের আল-বাঁধা রাস্তায় লোহার-খুর-লাগানো নাগরায় শব্দ হয় খট খটাখট—দূর থেকে বাঁশের মোটা লাঠির ডগা দেখা যায়। ছোটো ছোটো ছেলের দল ভয়ে মায়ের আঁচল চেপে ধরে। খিটখিটে বুড়িরা শাপমুনি দিতে থাকে। জমিদারকে টঙ্ক দিতে গিয়ে চাষিরা ফকির হয়।

পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে এ-অঞ্চলে জমিদারের একটা আইন ছিল—তাকে বলা হতো হাতিবেগার। জমিদারের বেজায় শখ হাতি ধরার। তার জন্য পাহাড়ে বাঁধা হবে মাচা। মাচার ওপর সেপাইসান্ত্বী নিয়ে নিরিবিলিতে বসবেন জমিদার; সেই সঙ্গে পান থেকে চুন না খসে তার ঢালাও ব্যবস্থা। আর প্রত্যেক গাঁ থেকে প্রজাদের আসতে হবে নিজের নিজের চালচিড়ে বেঁধে। যে জঙগলে হাতি আছে, সেই জঙগল বেড় দিয়ে দাঁড়াতে হবে। ছেলে হোক বুড়ো হোক কারো মাপ নেই। যারা হাতি বেড় দিতে যেত, তাদের কাউকে সাপের মুখে, কাউকে বাঘের মুখে প্রাণ দিতে হতো।

মানুষ কতদিন এসব সত্য করতে পারে? তাই প্রজারা বিদ্রাহী হয়ে উঠল। গোরাচাঁদ মাস্টার হলেন তাদের নেতা। চাকলায় চাকলায় বসল মিটিং, কামারশালায় তৈরি হতে লাগল মারাত্মক অস্ত্রসম্ম। শেষ পর্যন্ত জমিদারের পল্টনের হাতে প্রজাদের হার হলো। কিন্তু হাতি-বেগার আর ঢলল না।

এখনও চৈতননগরে, হিঙ্গুরকোণায় গেলে খগ মোড়ল, আমুতো মোড়লের বংশধরদের মুখে বিদ্রোহের গল্প শোনা যায়। থুরথুরে বুড়ো যারা, তারা দুখু করে বলে, সেকালে সর্বের ক্ষেতে আমরা লুকোুৰি খেলতাম; মাঠে এত ধান হতো যে কাকপক্ষীরও অরুচি ধরত। গোয়ালে থাকত ষাট-সন্তরটা গোরু; নর্দমায় দুধ ঢালাই হতো। আর এখন? এক ফোঁটা দুধের জন্যে পরের দুয়োরে হাত পাততে হয়।

একটা কথা আগে থেকে বলে রাখি। ও-অঞ্চলে যদি কখনও যাও, ওরা তোমাকে ‘বাঙ্গাল’ বলবে। চটে যেয়ো না যেন। বাঙ্গাল মানে বাঙালি। বাংলাদেশে থাকলেও ওদের আমরা আপন করে নিইনি—তাই ওরাও আমাদের পর-পর ভাবে।

অথচ আমরা সবাই বাংলাদেশেরই মানুষ।





## ছাতির বদলে হাতি

নাকের বদলে নরুন পেলাম টাক ডুমা ডুম ডুম। কিন্তু শুধু একটা ছাতির বদলে এক নয়, দুই নয় একবারে তিন বারোঁ ছত্রিশ বিঘে জমি—নাকের বদলে নরুন তো তার কাছে কিছুই নয়। বিশ্বাস না হয়, বেশ, একবার হালুয়াঘাট বন্দরে যেয়ো। সেখানে মনমোহন মহাজনের গদিতে গেলেই বুবাবে কী তেজ বন্ধকি-তেজারতির। মনমোহন মহাজন গত হয়েছেন অনেক দিন; কিন্তু সেই মহাজনের পন্থা আজও টিকে আছে।

পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেকার কথা। হালুয়াঘাট বন্দরে গারো পাহাড়ের নীচের এক গাঁ থেকে সওদায় এসেছিল এক গারো চাষি। নাম তার চেংমান। এমন সময় দেও-দেবতা স্তুতি, দিক-পৃথিবী কম্পিত করে মুঘলধারে বৃষ্টি। সে বৃষ্টি ধরবার কোনো লক্ষণই নেই।

এদিকে দিন তো হেলে, রাত তো টলে—বাড়ি ফেরার উপায় কী? মনমোহন মহাজনের দোকানের বাঁপির নীচে চেংমান আশ্রয় নিয়েছিল।

হঠাতে মহাজন যেন করুণার অবতার হয়ে উঠল। একেবারে খাস কলকাতা থেকে খরিদ-করে আনা আনকোরা নতুন একটা ছাতা চেংমানের মাথার ওপর মেলে দিয়ে মনমোহন বলল : ‘যা যা, ছাতিটা নিয়ে বাড়ি চলে যা। নিজে ভিজিস তাতে কিছু নয়, কিন্তু এতগুলো পয়সার সওদা যে ভিজে পয়মাল হয়ে যাবে।’

মহাজনের দরদ হঠাতে কীসে এত উত্তলে উঠল? চেংমান দোমনা হয়ে ভাবছে নেব কি নেব না। নিশ্চয় অনেক দাম। হাতে পয়সাও তো নেই।

‘নগদ পয়সা নাই বা দিলে। যখন তোমার সুবিধে হবে দিয়ে গেলেই হলো। ওর জন্যে কিছু ভেবো না।’—মনমোহন ভরসা দেয়।

চেংমান ভাবল এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। নতুন ছাতি মাথায় দিয়ে মহাফুর্তিতে বাড়ির দিকে সে চলল। ছেলে-পুলে-বউ তার পথ চেয়ে বসে আছে। চেংমান গেলে তবে হাঁড়ি চড়বে।

চেংমান ফি বার হাটে যায়। মনমোহনকে বলে, ‘বাবু, পাওনাগভা মিটায়ে নেন।’ মনমোহন ফি বারই বলে, ‘আহা-হা অত তাড়া কীসের, সে দিও ক্ষণ পরে।’ এমনি করে বছর, তারপর বছর যায়। ধার করে ছাতি কেনার কথা চেংমান ভুলেই গেল। হঠাৎ একদিন হাটবারে মনমোহন চেংমানকে পাকড়াও করে। ‘—কী বাছাধন, বড়ো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ। পাওনা মিটিয়ে দিয়ে যাও।’ মনমোহনের কথায় চেংমানের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। চেংমান বুঝতে পারে এবার সে ইঁদুরকলে পড়েছে।

মনমোহন তার লাল খেরোয় বাঁধানো জাবদা খাতা বার করে যা পাওনা হিসেব দেখাল, তাতে চেংমানের চোখ কপালে উঠল। এই ক-বছরে চক্রবৃদ্ধিহারে ছাতির দাম বাবদ সুদসমেত পাওনা হয়েছে হাজার খানেক টাকা। প্রায় একটা ছাতির দাম।

বিশ্বাস করো, বানানো গল্প নয়। যদি যাও ও-অঞ্জলে, পাকাচুল প্রত্যেকটা ডালু-হাজং-গারো চাবি এর সাঙ্গী দেবে।

ডালুদের প্রাম কুমারগাঁতির নিবেদন সরকারের মুদিখানায় দু-দশ বছর বাকিতে মশলাপাতি কেনার জন্যে নিবেদনের ছেষটি বিষে জমি মহাজন কুটিশ্বর সাহা এমনিভাবে দেনার দায়ে কেড়ে নিয়েছে। আরেক ধূরন্ধর মহাজন এক চাষিকে ধারে কোদাল দিয়ে পরে তার কাছ থেকে পনেরো বিষে জমি মোচড় দিয়ে নিয়েছিল।

ও-অঞ্জলের পঞ্জাশ্টা প্রামে ডালুদের বাস। কথাবার্তায় পোশাক-পরিচ্ছদে হাজংদের সঙ্গে এদের খুব বেশি মিল। কে ডালু, কে হাজং বোঝাই যায় না। কিন্তু ডালুদের জিজ্ঞেস করো, ওরা বলবে—হাজংরা জাতে ছোটো। হাজংরাও আবার ঠিক উলটো বলবে।

ডালুরা বলে, সে দিন আর নেই। আগে ছিল তারা অন্ধ বোকার জাত। পাহাড়ের নীচে যেদিন থেকে লাল নিশান খুঁটি গেড়েছে, সেই দিন থেকে তাদের চোখ ফুটেছে।

সে এক দিন ছিল বটে। শুধু মনমোহন মহাজন আর কুটিশ্বর সাহাই নয়—ছিল জোতদার আর তালুকদারদের নিরঙ্কুশ শাসন। আর সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সিংহের দাপট। সিংহ—যার ভালো নাম পশুরাজ।

জমিদারের খামারে জমির ধান তুলতে হবে। জমিদারের পাওনা মিটিয়ে তবে চাষি তার ঘরে ধান নিয়ে যেতে পারত। চুক্তির ধান তো বটেই, কার ওপর কর্জার ধান শোধ দিতে হতো টাকায় এক মণ হিসেবে। তাছাড়া আছে হাজার রকমের বাজে আবওয়াব। অর্থাৎ খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি। যেচাষি বুকের রক্ত জল করে এত কষ্টে ফসল ফলাল শেষটায় তাকে শুধু পালা হাতে করে ঘরে ফিরতে হতো।

এদিকে আর এক রকমের প্রথা আছে—নানকার প্রথা। নানকার প্রজাদের জমিতে স্বত্ত্ব ছিল না। জমির আমকাঁঠালে তাদের অধিকার ছিল না। জমি জরিপের পর আড়াই টাকা পর্যন্ত খাজনা সাব্যস্ত হতো। খাজনা দিতে না পারলে

তহশিলদার প্রজাদের কাছারিতে ধরে নিয়ে যেত, পিছমোড়া করে বেঁধে মারত; তারপর মালঘরে আটকে রাখত। নিলামে সব সম্পত্তি খাস করে নিত। মহাজনেরা কর্জা ধানে এক মণে দু-মণ সুদ আদায় করত।

কিন্তু নওয়াপাড়া আর দুমনাকুড়া, ঘোষপাড়া আর ভুবনকুড়ার বিরাট তল্লাটে ডালু চাষিরা আজ জেগে উঠেছে। তারা বলেছে, জমিদারের খামারে আমরা ধান তুলব না। ধান তারা তোলেনি। পুলিশ-কাছারি কিছুতেই কিছু হয়নি। শেষে জমিদার হার মেনেছে।

আজ তারা গর্ব করে বলে, বন্দরের ভদ্রলোকেরা আজ আর আমাদের তুই-তুকারি করতে সাহস পায় না। ‘আপনি’ বলে সন্তাষণ করে। থানায় চেয়ার ছেড়ে দেয় বসতে। আমরাও অনেক সভ্য হয়েছি। আগে বাপ-ছেলে একসঙ্গে বসে মদ খেত, এখন মদ খাওয়া সমাজের চোখে খুবই লজ্জার বিষয়।

হালবলদের অভাবে চাষ-আবাদের আজকাল বেজায় মুশকিল। এখানকার চাষিরা তাই সবাই মিলে গাঁতায় চাষ করে। চাষ করতে করতে ওরা ছেলেমেয়েরা মিলে গান ধরে :

শুনো শুনো বন্ধু গো ভায়া  
রোয়া লাগাইতে চলোগো এলা।  
বন্ধুর জমিখানি দাহাকোণা  
হাল জরিছে মেয়মেনা  
হাল বো আছে  
নি' উথি মাতি রে  
কত বা লাগাব নিতি নিতি,...

চলো বন্ধু! এখন রোয়া লাগাতে যাই। পাহাড়ের নীচে আমাদের জমি; হালের ভারে মোষের শিং নুয়ে পড়েছে। আমরা হাল বাইছি ভাই, আমরা হাল বাইছি। কিন্তু কঠিন মাটি উঠতে চায় না। কী কষ্ট! কী কষ্ট!

যারা এত কষ্ট করে আমাদের মুখে অন্ন জোগায়—ইচ্ছে করে, জমিদারের হাত থেকে বাংলার সমস্ত জমি তাদের হাতে দিই, মহাজনের নিষ্ঠুর ঝাগের বোঝা থেকে তাদের মুক্তি দিই। তোমাদের কি ইচ্ছে হয় না?





## দীপঙ্করের দেশে

সামনে বাবলা বনের ভেতর দিয়ে ধু ধু করছে নদী। নাম কীর্তিনাশ। সাদা বকের মতো পাল উড়িয়ে নৌকা ছুটছে সাঁই সাঁই। একতলা নীচু পাটের জমি গাঁয়ের রাস্তা থেকে গড়ান হয়ে নেমে গেছে হুই ঘাট-বরাবর। দু-বছর আগের কথা। চোখ বুঁজলে আজও যেন সব দেখতে পাই। আসবাব দিন স্টিমার থেকে ঝাপসা দেখতে পাচ্ছি রানিনগরের এতিমখামা—রোদুরে বিকমিক করছে টেউখেলানো করোগেটের টিন। দূরে পুতুলের মতো ক্ষুদে ক্ষুদে দেখা যাচ্ছে।—কে আলি হোসেন না গোরাঙ্গ? মজিদ না রাধাশ্যাম?

গিয়েছিলাম ঢাকার বিক্রমপুর পরগনায়। এই বিরাট পরগনাকে বলে মুনশিগঞ্জ মহকুমা। বিক্রমপুরের মাটিতে মিশে আছে অনেক দিনের ইতিহাস। এখানকার প্রাচীন বৌদ্ধস্তুপে পাওয়া গেছে বহুকালের বিস্মৃত শিলালিপি। পুরোনো দিনের ইতিহাসের সাক্ষী অনেক সায়র, অনেক বিল আজ বিক্রমপুরের প্রামে প্রামে ছড়িয়ে আছে। যাঁর পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় দূর নেপাল থেকে সুদূরে শ্যামসুমাত্রা পর্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিল, সেই স্বনামধন্য দীপঙ্করের জন্মভূমি এই বিক্রমপুর।

...স্টিমার এসে থামল তারপাশায়। জেটি থেকে ডাঙা অনেকটা তফাতে। মাঝখানে সরু সরু তক্তা জোড়া দেওয়া লম্বা নড়বড়ে পুল। মোটদ্বাট মাথায় নিয়ে পার হবার সময় মনে হয় বৈতরণী পার হচ্ছ। একরাশ লোকের ভাবে পুল ভাঙ্গে-ভাঙ্গে হয়, নীচের দিকে তাকালে মাথা বিমর্শ করে। কালো কালো টেউগুলো সব মুখে ফেনা তুলে গজরাচ্ছে। কুমিরের মতো হাঁ করে আছে, জিভ দিয়ে যেন তাদের জল গড়াচ্ছে। সরু

নড়বড়ে পুলের ওপরকার মানুষগুলোর পিছু নিতে নিতে তারা যেন বিড় বিড় করে বলছে—ফসকালেই হয়! ফসকালেই হয়!

টলতে টলতে পড়ি কি মরি করতে করতে কোনোরকমে তো প্রাণ নিয়ে ডাঙায় এসে উঠলাম। উঠেছি কী অমনি সপাং সপাং চাবুকের মতো এক বলক বালি এসে চোখমুখ কানা করে দিল। সারাদিন ঠায় রোদুরে পুড়ে মেজাজ তাদের তিরিক্ষি হয়ে আছে। যেখানে লাগে ফোসকা পড়িয়ে দেয়।

নদীর পাড়ে গোটাকয়েক চা-জলখাবারের দোকান। চারিদিকে আর জনমনিয়ি নেই। চায়ের গেলাসে গলা পর্যন্ত থিক করছে বালি। দোকানের চালাগুলো নতুন। ঘাট ছিল আগে আরও ওপাশে, এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। নদী ভাঙতে ভাঙতে চলেছে; সামনেই নদীর ঠিক বুকের ওপর অস্পষ্ট নতুন চর জেগে উঠেছে।

যাব মেদিনীমঞ্চ! উত্তরে অনেকটা রাস্তা। যতদূর নজর যায় লোক চোখে পড়ে না। গ্রামগুলো খাঁ খাঁ করছে।

আকালের বছরে সব শেষ হয়ে গেছে। কামারবাড়িতে গ্রামের দু-একজন বুড়ো লোকের সঙ্গে দেখা হয়। পোড়াকাঠের মতো চেহারা—সারা গায়ে দগদগ করছে খোসপাঁচড়।

বিপিন কর্মকার দৃঢ়খের কাহিনি বলতে হাপুস নয়নে কাঁদে। ঘরের যথাসর্বস্ব বেচে দিয়েও ডাগর ছেলেটাকে সে বাঁচাতে পারেনি। হাতুড়ি, নেহাই জলের দরে বিক্রি করে দিয়েছে বন্দরের মহাজনের কাছে। শুধু হাপরটা আজও পারেনি—তাতে লোহা না পুড়ুক, কঙ্কের আগুন ধরানো চলে। গাঁয়ের পুরুত্বাকুরও কানাকাটি করে; সব গিয়ে শুধু পৈতেগাছটা আছে। বারো মাসের তেরো পার্বণের দিন আর নেই। যতদিন গাঁয়ে বসন্ত আছে, শীতলা মার পুজো চলবে। কিন্তু তাও আবার উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ। চারগন্ডা পয়সাও দক্ষিণা পাওয়া যায় না। ঠাকুর মশাই দুখ্য করে বলে, বামুন হয়ে জন্মেছি; না করতে পারি চায়ের কাজ, না করতে পারি কুলিগিরি। আমাদের সব দিক দিয়েই মরণ।

গাঁয়ের অর্ধেক লোক দেশত্যাগী হয়েছে। কে কোথায় গেছে কেউ জানে না। যারা এখনও মাটি কামড়ে পড়ে আছে, তারাও যাব যাব করছে। ঘরে মানুষ হয় জুরে কাতরাচ্ছে, না হয় তো খালি কোলে মেয়েরা ডুকরে কাঁদছে। মুসলমানপাড়ায় চুকলে দেখা যায় বাড়ির উঠোনগুলো উঁচু টিবি হয়ে আছে। যারা মরেছে তাদের দূরে নিয়ে গিয়ে কবর দেবারও সামর্থ্য ছিল না যে কারও।

জেলেপাড়া, যুগিপাড়া সাফ হয়ে গেছে। গাঁয়ের রাস্তায় হাঁটিতে গা ছমছম করে। বাড়িতে বাড়িতে আর সন্ধে জুলে না, শাঁখও বাজে না। রান্তিরে ঝাড় উঠলে হারিকেন হাতে ছেলের দল আমবাগানে আর ছুটে যায় না। পাকা আম মাটিতে পড়ে পচে যাচ্ছে। বাপের জন্মে কেউ এমন দেখেনি।

খৰিপাড়ায় আর ডুগ ডুগ বাজনা বাজে না। ভাগাড়ে গোরু পড়ে না—চামড়া পাবে কোথেকে? হালবলদ বেচে দিয়ে চাবিরা বিশ টাকায় দশ সের চালও ঘরে আনতে পারেনি।

সব গাঁয়ের সব লোকের এক দশা। তেমনি আবার গাঁয়ের দু-চার জন লোক এই দুর্ভিক্ষে তাদের ভোল ফিরিয়েছে। যেমন আমতলার মেজুদি ব্যাপারী। টঙ্গিবাড়ি বাজারে ছিল তার ভুষিমালের দোকান। চালের কারবার করে দুদিনে সে ফেঁপে উঠল। দারোগা-পুলিশকে ঘুষ দিয়ে বাইরে থেকে বস্তা বস্তা চাল এনে মেজুদি মজুত করেছিল। ভাতের অভাবে লোক যখন বাজারের রাস্তায় এসে মাছির মতো মরাছিল, তখন মেজুদি সেই চাল বেচেছে আশি টাকা মন দরে। গাঁয়ের লোক জলের দামে জমি বেচেছে, সেই জমি কিনে মেজুদি হয়েছে হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক। মেজুদির টিনের চালা ভেঙে পাকা দালানকোঠা উঠেছে।

লোহজঙ্গ বন্দরের ব্যাপারীরা ভারী মুশকিলে পড়েছিল। দিঘলীর খাল যেখানটায় পদ্মায় গিয়ে পড়েছে, তারই মুখে দোকানপাট, গুদাম আর মহাজনদের গাদি। যত লোক না খেয়ে রোগে হাত-পা ফুলে মরেছে, তাদের টেনে টেনে খালের জলে ফেলা হয়েছে। এদিকে স্তুপাকার শবদেহে খালের মুখ পর্যন্ত বুঁজে গিয়েছে। দুর্গন্ধে বন্দরে টেকা দায়। বন্দরের মহাজনরা মহা ফাঁপড়ে পড়ল। এ যেন লোকগুলো মরে গিয়ে তাদের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে। শেষপর্যন্ত বাইরে থেকে মাইনে-করা ডোম আনতে হলো খাল থেকে মড়া ফেলার জন্যে। মহাজনদের গাঁটের কড়ি বেশ কিছু খরচ করতে হলো। কিন্তু মানুষ মেরে যা লাভ তারা করেছে তার তুলনায় তা কিছুই নয়। মানুষ মেরে তারা লাভ করেছে মাথাপিছু হাজার টাকা, আর প্রত্যেকটা মড়া ফেলার জন্য তাদের খরচ হয়েছে আট আনা কি এক টাকা।

তাছাড়াও আকালের মরশুমে কত রকমের ভেক, কত রকমের বুজবুকির সৃষ্টি হয়েছে। হাঁসাইলের বিক্রমাদিত্য পর্বত। নাম শুনলে হাসি পায়। লোকটা ছিল হোমিওপ্যাথির ডাক্তার। গাঁয়ে যখন মড়ক লাগল, হঠাৎ দেখা গেল সে গেরুয়া পরে সন্ধ্যাসী সেজে গাছতলায় বসেছে। লোকজনকে দিচ্ছে স্বপ্নাদ্য ওযুধ। ওযুধ না ছাই! কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল রোগাপটকা লোকটার গায়ে মাংস লেগেছে। যখন মড়ক থেমে গেল, তখন দেখা গেল পর্বত আবার পুনর্মূষিক হয়েছে, গেড়য়া ছেড়ে হোমিওপ্যাথি ধরেছে।

রানিনগর গ্রামে পৌঁছুতেই দু-একবার একবার বিদ্যুত চমকিয়ে আকাশ একেবারে ভেঙে পড়ল। সামনে টিনের একটা আটচালা। লেখা রয়েছে: রানিনগর এতিমখানা। যাঁর ওপর এতিমখানা চালানোর ভার তিনি সমাদর করে ঘরে বসাগেন। ভদ্রলোকের নাম আব্দুর রহমান। লোকে বলে, রহমান মাস্টার। লেখাপড়া ইংরিজি-বাংলা ভালোই জানেন।

গ্রামের প্রাইমারি ইস্কুলে আর পোস্টপিসে দু-জায়গাতেই এক সঙ্গে তিনি মাস্টারি করতেন। সেই থেকে সবাই তাঁকে রহমান মাস্টার বলে ডাকে। মুখে সর্বদা একটা মিষ্টি হাসি লেগে আছে।

রহমান মাস্টারের কাছে শুনলাম, ও-অঞ্জলের দুর্দশার কথা। বিক্রমপুরের অধিকাংশ লোকই থাকে বাইরে বাইরে। চাকরি করে, ব্যাবসা করে আর মনি অর্ডারে বাড়িকে টাকা পাঠায়। এত মনি অর্ডার আর কোনো দেশে আসে না। তবু চিরকাল বিক্রমপুরের নাম ছিল, সমৃদ্ধি ছিল। ছুটির সময় গ্রামগুলো লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠত। আজ ফুটবল, কাল নৌকা-বাইচ—খুব আনন্দে দিন কাটিত। দু-তিন মাস জলে জলে কাটিয়ে জেলেরা ফিরত ঘরে। দেশবিদেশের গল্পে জমে উঠত আসর। দুর্ভিক্ষ এসে সব চুরমার করে দিয়েছে। চালের দাম উঠেছে চলিশ থেকে আশি টাকায়। নাতিপুতি-বউ নিয়ে বিধবা মা রাস্তার দিকে হাপিত্যেশে চেয়ে আছেন কবে মনি অর্ডারে ছেলের কাছ থেকে টাকা আসবে। শেষ পর্যন্ত পিওন এল—কিন্তু টাকা নিয়ে নয়, ছেলের মৃত্যু খবর নিয়ে। এমনি করে শেষ হয়ে গেছে কত সংসার। সব কিছু গিয়ে শুধু ভিটেমাটিতে এসে ঠেকেছে।

নতুন লোক দেখে এতিমখানার ছেলেমেয়েরা পড়ার বই রেখে দিয়ে ছুটে আসে। আলি হোসেন, গৌরাঙ্গ, আজিমুম্মেসা, সুকুরবানু, হরিদাসী, মজিদ, রাধাশ্যাম—একে একে আলাপ হয়। দুর্ভিক্ষে বাপ-মা মরা ছেলেমেয়েদের নিয়ে এক সৃষ্টিছাড়া সংসার গড়ে উঠেছে। সকলের বড়ো আলি হোসেন। বড়ো ভাইয়ের মতো সকলকে সে আগলায়।

আলি হোসেনের বাড়ি ত্রিপুরায়। চাঁদপুরে স্টিমারে উঠে ভিক্ষে করছিল। স্টিমার ছেড়ে দেওয়ায় আর নামতে পারেনি। একেবারে নেমেছিল তারপাশায়। সেখানে থেকে গিয়েছিল মাওয়ার বাজারে। বাজারের লঙ্গরখানায়

একবেলা খিচুড়ি খেত আর রান্তিরে পড়ে থাকত দোকানের দাওয়ায়। রান্তিরে ঘুম হতো না ঠাণ্ডায়। গায়ের চামড়া ফেটে রক্ত বেরোত। তার ওপর মাছি বসে বসে দগদগে ঘা হয়ে গিয়েছিল। আলি হোসেনকে তাই বাজারের লোকজন পাঠিয়েছিল রিলিফ হাসপাতালে। সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছে রান্নিঙ্গরের এতিমখানায়। বাপ-মার কথা জিজ্ঞেস করলে দশ বছরের ছেলে আলি হোসেনের চোখগুলো ছোটো ছোটো হয়ে আসে; আর বোধহয় কান্না চাপার জন্যেই তিনি বছরের ছেটো বোন হরিদাসীকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে। আলি হোসেনের বাপ-মা ভাইবোন নিজের বলতে কেউই নেই।

ছোটো হলে কী হয়, বাপ-মার কথা গৌরাঙ্গের মনে আছে। গৌরাঙ্গদের বাড়ি পাবনা জেলায়। বাপ তার ঘরামির কাজ করত। এরবার উঁচু চালের মটকা বাঁধতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে গিয়েছিল গৌরাঙ্গের বাবা। তবু খোঁড়া পা নিয়েই আবার কাজে লেগেছিল। কিন্তু গাঁয়ে আর কাজ পাওয়া গেল না। তারপর চালের দাম হলো চলিশ টাকা। নক্ষররা গাঁয়ের বড়ো জোতদার। তাদের পা ধরে গৌরাঙ্গের বাবা কত কাঁদাকাটা করল—দু-সের ধানও তারা কর্জ দিল না। তারপর থালা-বাটি সব বিক্রি করেও যখন আর বাঁচা গেল না, তখন গৌরাঙ্গের বাবা গলায় দড়ি দিয়ে মরল। গৌরাঙ্গের ছোটো বোনটাও দুদিন পরে মারা গেল। গৌরাঙ্গের মা কদিন খুব বুক চাপড়ে কাঁদাকাটা করল, তরপর কোথায় যে চলে গেল গৌরাঙ্গের আর খুঁজে পেল না। সিরাজগঞ্জের ঘাটে গৌরাঙ্গ ভিক্ষে করছিল, তাই দেখে এক ভদ্রলোক তাকে নিয়ে আসে মাওয়ার বাজারে।

আজিমুন্নেসা আর সুকুরবানু দই বোন। বড়ো আজিমুন্নেসার মুখে আগুনে পোড়া দাগ। আগুনে পোড়ার কথা বললে এখনও আজিমুন্নেসার গায়ে কঁটা দিয়ে ওঠে।

আজিমুন্নেসার বাপ সলিমুল্লা ছিল কুমারভোগের তাঁতি। অভাবে তাঁত বেচতে হলো সলিমুল্লাকে। শেষ পর্যন্ত শোথ হয়ে সলিমুল্লা মারা গেল। আজিমুন্নেসার মা নিরূপায় হয়ে আবার বিয়ে করল—কিন্তু নতুন সংসারে মেয়ে দুটির আর ঠাঁই হলো না। আজিমুন্নেসা আর সুকুরবানুর দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় দয়া করে তাদের আশ্রয় দিল। কিন্তু অভাব কার সংসারে নেই। তাদের এমন হলো যে আর দিন চলে না। মনুষ্যত্ব পর্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল। একদিন আজিমুন্নেসাকে ক্ষিধেয় কাঁদতে দেখে বাড়ির কর্তা মেরেটার মুখ উন্মনের মুখে চেপে ধরল। মন গুলো সব পাষাণ হয়ে গেছে। শেষকালে সুকুরবানুর চিৎকারে পাড়ার লোক ছুটে এসে আজিমুন্নেসাকে বাঁচাল।

এতিমখানার ছোটো ঘরটার মধ্যে এমনি দৃঢ়খের কাহিনি যেন জমাট বেঁধে আছে।

মজিদকে জিজ্ঞেস করলাম, বড়ো হয়ে তুমি কী করবে? মজিদের চোখ হঠাত জলে ওঠে; হাতের মুঠোটা শক্ত করে বাগিয়ে ধরে বলে, বড়োলোকদের শেষ করব।

—কথাটা বোধহয় রহমান মাস্টারের শেখানো।

রান্নিঙ্গরের এতিমখানা থেকে বেরিয়ে পড়লাম রাত ফরসা হবার আগেই। আলি হোসেন আর গৌরাঙ্গ, মজিদ আর রাধাশ্যাম, আমিনা আর হরিদাসী সকালে ঘুম ভেঙে উঠেই আমাকে খুঁজবে জানি। ঘণ্টা কয়েকের মাত্র আলাপ। তারই মধ্যে ওরা আমাকে আপন করে নিয়েছে।

কিন্তু ওদের ঘুম থেকে তুলে বিদায় নেব, সে সাহসও নেই। যাচ্ছ শুনলে সুকুরবানু যদি কাঁদে? বলা যায় না, যদি আমার চোখই ঝাপসা হয়ে ওঠে?—তাই বিদায় না নিয়েই বোঁচকাবুচি কাঁধে ফেলে রওনা হই। হাত ধরে

বাঁশের সরু সাঁকোটা পার করে দিলেন রহমান মাস্টার। তারপর মুঠো করা হাত ওপরের দিকে তুলে কী একটা কথা বলতে চাইলেন। ঠেঁট দুটো ফাঁক হতে দেখলাম, কিন্তু কোনো আওয়াজ বেরোল না। হঠাৎ পেছন ফিরে রানিনগরের রাস্তা-বরাবর মাটিতে চোখ রেখে হন হন করে হাঁটতে লাগলেন রহমান মাস্টার। খানিকক্ষণ থমকে দাঁড়ালাম।—বিচি এই পৃথিবী, বিচি মানুষের ভালোবাসা।

আবার পথ-চলা শুরু হয়। ঘোড়দৌড়ের বাজার পেরিয়ে লৌহজঙ্গ। মুনশিগঞ্জ ঘাট থেকে সোনারং আর টঙ্গিবাড়ি, কমলাঘাট আর বজ্রযোগিনী।

রাস্তার দুপাশের গাছে অজস্র পাকা গাব। পাতা দেখা যাচ্ছে না গাছের।

ঘাট থেকে ফিরছিল এক বুড়ো। হঠাৎ সে গাছগুলোর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, দেখেছেন?—একটু অবাক হয়ে গেলাম। লোকটার প্রশ্ন শুনে নয়, প্রশ্নের সঙ্গে তাকে দীর্ঘনিশ্চাস ফেলতে দেখে। বেশ তো লাল টুকটুকে ফল ধরেছে গাছে। তাতে মন খারাপ করবার কী আছে?

আছে। কেননা এ-দৃশ্য নাকি এ-অঞ্চলে তিন কালে কেউ দেখেনি। বর্ষার মরশুম শুরু হয় হয়। নৌকো মেরামতের এই হচ্ছে সময়। অন্য অন্য বার এক টের আগেই নৌকো সারানোর ধূম পড়ে যায়। এ-সময় গাছে গাব পাকতে পারে না। কারণ গাবের আঠা দিয়ে না জুড়লে নৌকো মেরামতই হয় না। কিন্তু গাব রইল গাছে। নৌকো সারাবে কীসে?

বুড়ো বলে, আজ কারো নৌকোই নেই, তার আবার সারাবে। জ্বালানির অভাবে নৌকোর কাঠ সব চেলা করে লোকে মড়া পুড়িয়েছে। আর আজ তারা আসমানে মেঘের চিড়িক দেখে আর কপাল চাপড়ায়। কী করে তারা এ-বর্ষা কাটবে? দু-দিন পরেই জলে থইথই করবে গোটা তল্লাট। নৌকো না হলে হাটেবাজারে যাওয়া দূরের কথা, পাড়াপড়শির বাড়িতে যে একটু দুঃখের গল্প বলতে যাবে, সে উপায়ও থাকবে না।

বুড়ো যে-গাঁয়ে থাকে, নাম তার নেত্রাবতী। গাঁয়ের রাস্তায় চলতে চলতে সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, শুনতে পাচ্ছেন? কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলাম। একটা ঝিঁঝি অনেকক্ষণ ধরে ডেকে চলেছে। মাথা খারাপ নাকি বুড়োটার? পাগলের পাল্লায় পড়ে শেষটায় বেঘোরে মারা পড়ব নাকি?

এতক্ষণ ভালো করে তাকাইনি। বসন্তে পোড়-খাওয়া ঘা-দগদগে বীভৎস মুখ বুড়োটার। মাথার চুল সব উঠে গেছে। ফাঁকা ফাঁকা দুটো চোখ কোটবের মধ্যে ঢোকানো। এমনভাবে তাকিয়ে থাকে, চোখের পাতা পড়ে কি পড়ে না বোঝা যায় না।

একটা পা মাটিতে আছড়িয়ে বুড়ো বলে, এই মাটি কাঁপত আগে হাতুড়ি আর নেহাইয়ের গমগম আওয়াজে। মিস্ত্রিপাড়ায় চুকতে আজ গা ছম ছম করে। পোড়ো ভিটেগুলোর ওপর দিনদুপুরে শেয়াল ডাকে।

বুড়ো আমাকে ভেবেছিল রিলিফের লোক। একটু পরে ভুল যখন তার ভেঙে গেল, তখন একটু গরম হয়েই বলল—এসেছেন কেন এই পোড়া দেশে? মানুষ মরে ফৌত হয়ে গেছে তাই দেখতে?

আমার তখন এমন অবস্থা, পালাতে পারলে বাঁচি। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকা এই বুড়োকে কী করে আমি বোঝাই যে, কঙ্কালের ছবি এঁকে আমি বাঁচা আর আধ-বাঁচা মানুষগুলোকে জাগাব? দানছত্রের খুদকুঁড়ো নিয়ে আসিনি আমি। আমি এসেছি পাথরে পাথরে চকমকি ঠুকে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালাতে। কেমন করে বলি?

ডান পাশে কচা গাছের বোপের ভেতর দিয়ে একটা অজানা গাঁয়ের রাস্তা। সেদিকে পা বাড়াতেই বুড়ো হাঁ হাঁ করে উঠল—ও-গাঁয়ে যাবেন না।

রাগে সর্বাঙ্গ জুলে উঠল। আচ্ছা লোক তো? জমিদারি নাকি ওর যে, বারণ করবে?

চটেছি বুঝতে পেরে বুড়ো নিজের থেকেই বলল—দেখুন ও-গাঁয়ে মেয়েদের পরবার কিছুই নেই। খাটতে তো হয়। তাই দিনের বেলায় ঘরেও বসে থাকতে পারে না। আপনি গেলে ওরা ভারি লজ্জা পাবে।

শুনে থ' হয়ে গেলাম। কোন দেশে আছি আমরা? কোন শতাব্দী এটা? চিন্তার মধ্যে সবকিছু যেন এলোমেলো হয়ে গেল।

কাটা একটা আঙুল শুধু চোখের ওপর ভেসে উঠল—যে-আঙুল কেটে নিয়েছে ইংরেজ বেনের দল। যে-আঙুলে বোনা হতো একদিন দুনিয়া-জয়-করা ঢাকাই মসলিন, সেই কাটা আঙুলের রক্ত আজও বন্ধ হয়নি। চোখ বুঝে সুর্যের দিকে তাকালাম, সেই রক্ত। আজও বোপটার দিকে তাকিয়ে দেখি গাছের ডালে থমকে আছে ফেঁটা ফেঁটা সেই রক্ত! দ্রৌপদীর বন্ত্র কেড়েছে যে দৃঃশ্যসন, তার রক্ত কবে ফিনকি দিয়ে বেরোবে?

আমতলীর বাজারে আসতে সন্ত্বে হয়ে গেল।

বাজারের পাশ দিয়ে গেছে খাল-বরাবর রাস্তা। অমাবস্যা কিনা জানি না। চারদিকে ঘূরঘূটি অন্ধকার। সেই অন্ধকারে একদল ছায়ামূর্তি মাথায় করে মোট বয়ে তুলে দিচ্ছে খালের নৌকোয়।

বাজারের এক ফড়ে যাচ্ছিল আমাকে সোনারঙ্গের রাস্তা দেখাতে। সে বলল, দেখলেন ব্যাপারখানা?

পরে সে যা বলল তাতে দেখলাম অবাক হবার কিছু নেই। সেন আর গুপ্ত, দন্ত আর মিঞ্চির বাড়ির মেয়েরা অন্ধকারে বেরিয়েছে মাথায় করে মোট বইতে। পেটে আগুন জ্বললেও দিনের বেলায় তাদের বাড়ির বাইরে যাবার জো নেই। তাতে ভদ্রহরের বদনাম হবার ভয় আছে। কিন্তু রাত্তিরের অন্ধকারে তো ইতরভদ্র সবাই সমান। তাছাড়া দেখছেই বা কে?

একটা কথা শুধু জিজ্ঞেস করা হয়নি—এত যাদের চক্ষুলজ্জা, শুক্রপক্ষে তারা কী করে?

টঙ্গিবাড়ি, সোনারং, বজ্যোগিনী—যেখানেই যাই সেই একই কাহিনি।

শুধু মাধবের মা-র কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। এতিমখানার বাঁশের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে—ওপারে মাধবের মা, এপারে মাধব। মা-র কোলে যাবার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে মাধব। কিছুতেই যেতে দেবেন না রহমান মাস্টার। মাধবের মা-র সারা গায়ে বিশাঙ্ক ঘা।

কতদিন পর মাধব দেখছে তার মাকে। কোথায় ছিল এতদিন? না খেয়ে সে যে মরে যাচ্ছিল! কিন্তু এ কোন মাকে সে দেখছে? গায়ের রং এমন কালো হয়ে গেল কেমন করে? গলে গেছে যেন সুন্দর মুখটা। পোড়া কাঠের মতো মা-র এ-চেহারা তো সে কোনোদিন দেখেনি। রহমান মাস্টার, দাও না আমাকে একবার মা-র কাছে যেতে।

যেমন ভালোবাসে, তেমনি হৃদয়হীন রহমান মাস্টার। কেঁদে মরে গেলেও রুশ মা-র কাছে ছেলেকে যেতে দেবেন না তিনি। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা তাঁর, টলাবে সাধ্য কার?

মা যেদিন চলে যায়, এক বছর আগের সেই দিনটার কথা মাধবের একটু একটু মনে আছে। দু-দিন উপোস করার পর কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছিল মাধব। ঘুম ভেঙে উঠে দেখে মা নেই। এপাড়া ওপাড়া কোথাও তার মা

নেই। তারপর গাঁয়ের এক আঙ্গীয়-বাড়িতে গিয়ে মাধব উঠেছিল। মা কোথায় গেছে জিজ্ঞেস করতে পাড়ার লোক আঙুল দিয়ে আকাশ দেখিয়ে দিত। সেই আকাশ থেকে যখন বৃষ্টি পড়ত তখন মাধবের মনে হতো দুঃখিনী মা তার কাঁদছে। বর্ষায় মন্টা ভারি খারাপ হয়ে যেত মাধবের।

যে-বাড়িতে জায়গা পেয়েছিল মাধব, সেই বাড়িতে লোকগুলো সব হঠাত হাত-পা ফুলে মরে গেল। তারপর না খেয়ে ধুক্তে-ধুক্তে মাধব এসে জুটল একদিন মেদিনীমণ্ডলের লঙ্গরখানায়। অনেকদিন পর বাজারের এক দোকানদার তাকে নিয়ে আসে এই এতিমখানায়।

এতদিন পর মার বুবি মনে পড়ল? আকাশ থেকে নেমে আসার সময় হলো? আর আকাশে যখন গেলই, তখন যাবার সময় একবার বলে যেতে পারত না কি? এ এক বছর কী কষ্টে গেছে তার, মা কি তার খবর পায়নি? দেখেনি কি আকাশ থেকে?—মাধব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

মাধবকে দেখে মাধবের মারও বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। দু-দিনের চেষ্টাতেও একমুঠো চাল জোগাড় করে মাধবকে খাওয়াতে না পেরে এক বছর আগে ভোরে উঠে নদীতে ডুবে মরতে গিয়েছিল মাধবের মা। কিন্তু নদীর কনকনে জলে ডুবে মরতে ভয় পেয়েছিল মাধবের মা। ছুটে চলে গিয়েছিল তাই ঘোড়দৌড়ের বাজারে। এক বছর ধরে মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যে একমাত্র কামনা ছিল মাধবের মার—মাধব আমার বেঁচে থাক।

সেই মাধব বেঁচে আছে রানিনগরের এতিমখানায়—এ খবর শুনে মাধবের মা ছুটে এসেছিল মাধবকে একবার শেষ দেখা দেখতে। মাথায় একটু বড়ো হয়েছে মাধব! বেড়ার ওপর থেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতে কী ইচ্ছেই না হচ্ছিল মাধবের মার। কিন্তু সর্বাঙ্গ যে তার গলে গলে খসে পড়ছে। ছেলের অকল্যাণের ভয়ে মনকে পায়াণ করে নিল মাধবের মা। তারপর একটা হাত দিয়ে দূর থেকে মাধবকে চুমো খেয়ে মাধবের মা অন্ধকারে আস্তে আস্তে চলে গেল।

পরে শুনলাম মাধবের মা ঘোড়দৌড়ের বাজারে আর ফিরে যায়নি। সোজা চলে গিয়েছিল যেদিকে পদ্মা সেইদিকে। এক বছর আগের চেয়েও নদীর জল এবার তের বেশি কনকনে হলেও ঠান্ডা জলের নীচে তলিয়ে যেতে মাধবের মার নাকি এবার একটুও ভয় করেনি।

ঢাকা থেকে ফিরে আসছি স্টিমারে। ধু ধু করছে নদী। নদীর নাম কীর্তিনাশ। সাদা বকের মতো পাল উড়িয়ে নৌকো ছুটছে সাঁই সাঁই করে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা সব নৌকোর মাঝি। তাদের বাপ-দাদারা মরেছে পঞ্চাশের আকালে; সামনে বাবলাবনের ভেতর দিয়ে ঝাঁপসা দেখতে পাচ্ছি রানিনগরের এতিমখানা। রোদুরে বিকমিক কছে করোগেটের টিন। দূরে পুতুলের মতো ক্ষুদে ক্ষুদে দেখা যাচ্ছে—কে আলি হোসেন না গৌরাঙ্গ? মজিদ না রাধাশ্যাম?

জলের মধ্যে ছলাত করে উঠল কী ওটা? মাধবের মা নয় তো?

কতদিন আগের কথা। চোখ বুজলে আজও যেন সব দেখতে পাই।





## বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ

সাতকাহনিয়া, সাগরপুতুল, সাগিরা, কেটালঘোষ, কাঁটাটিকুরি, আয়মা, দশ্মনি, বনবাহিনী—গ্রামগুলোর ভারি সুন্দর নাম। দূর থেকে মনে হয়, দিগন্দিগন্ত জুড়ে ফসলের মাঠ—সোনার ধান ওড়নার মতো হাওয়ায় উড়ছে। দুরে রোদুরে চিকচিক করছে জল। কাছে যাও সব মরীচিকার মতো মিলিয়ে যাবে। ধান নয়, নিষ্ফল বেনাবন; জলের চিহ্ন নেই, ত্বষিত বালুকণা। ফসলের কথা জিজ্ঞেস করলে গাঁয়ের মানুষ মাঠ থেকে মুঠো মুঠো বালি তুলে দেখিয়ে দেবে—মুখে একটা কথাও বলবে না।

স্টেশন থেকে নেমেই একটা ছোট জনপদ। কোঠাবাড়ির পাঁচিলগুলোতে জলের আঁচড় দেখিয়ে একজন বলল, ওটা বন্যার দাগ। দু-মানুষ সমান উঁচু। বর্ষায় এ-অঞ্চলের বাড়িঘর সব ডুবে যায়। মানুষেরা আশ্রয় নেয় কোঠাবাড়ির ছাদে আর খড়োঘরের মটকায়। চারিদিকে থইথই করে জল।

বেনাবনের ভেতর দিয়ে আলে আলে রাস্তা। সাবধানে যেতে হয়—খুরের মতো ধারালো ঘাস পায়ের পাতা কেটে বসে। ঘুপচির মতো হুল ফুটিয়ে দেয় বিছুটি পাতা। তারপর মাঠ। ধু ধু করছে বালি। দুপাশে তাকালে দেখা যায় পোড়োবাড়ির ভিট্টে, ভাঙা মন্দির—ইঁট ফুঁড়ে বট-অশথের গাছ গজিয়েছে। মাঠের মধ্যে বড়ো বড়ো খানখন্দ।

রাস্তাঘাটে মানুষজন চোখেই পড়ে না।

পো গ্রামে চুকতেই ময়রাদের পাড়া। বাঁদিকে মস্ত বড়ো একটা বাড়ি। শুনলাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় হয়েছে—বংশে বাতি দেবারও আর কেউ নেই। দিনের বেলা। তবু গা ছম ছম করে।

যে লোকটার কাছ থেকে ময়রাপাড়ার খবর পেলাম, নাম তার মুক্তিপদ বুজ। জাতে সেও ময়রা। এককালে গাঁয়ে দোকান ছিল, এখন সে মাঝে মাঝে পরের দোকানে চাকরি নেয়। আর এ গাঁয়ে যখন মেলা বসে তখন

দোকান দেয়। ময়রার ব্যাবসা ছেড়েছে সে আজ পাঁচ-ছ বছর। পাঁচ-ছ বিষে জমি ছিল তার, আজ সেখানে শুধু কেশোর বন; বালিতে চাষ করা অসম্ভব। ফসল হয় না, তবু ফি বছর জমির খাজনা গুনতে হয়।

গ্রামে চুকে দুশো হাতের মধ্যে ছ-সাতটা পোড়োবাড়ি দেখলাম—সবাই ম্যালেরিয়ায় মরেছে।

অথচ পঞ্জিশ বছর আগেও নাকি বর্ধমানের এসব অঞ্চলে লোকে হাওয়া বদলাতে আসত।

গাঁয়ের বৃদ্ধ ভোলানাথবাবুর সঙ্গে দেখা হলো। একটা শানবাঁধানো বুড়ো বটের ছায়ায় বসে তিনি পুরোনো দিনের গল্প শোনালেন। কী সুখেই না ছিল এখানকার মানুষ। সত্যিই ঘরে ঘরে গোলাভরা ধান আর গোয়ালভরা গোরু ছিল। বুড়ো বট তার সাক্ষী। কাঙালি ভোজন করাতে হলে অন্য জেলায় ছুটতে হতো—এ অঞ্চলে কোনো কাঙালি মিলত না।

আজ কেন যে এমন হলো, তা এখানকার শিশুরা পর্যন্ত জানে। বললেই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে অজয় নদের দিকে। হিংস্র পার্বত্য নদী অজয়। ছোটনাগপুরের পাহাড়ে তার উৎস। বর্ষা ছাড়া যে-কোনো সময় যাও, দেখবে ভারি নিরীহ নিজীব মূর্তি। এর গৈরিক জলে আছে পাথুরে দেশের পলি—যে পলিতে দেদার ফসল ফলে। বর্ষায় উদ্দাম হয়ে ওঠে এই নদী। বন্য হস্তীর মতো বাঁধ ভেঙে মাঠে মাঠে শুরু হয় ধৰ্মসের অভিযান—পায়ে পায়ে গুঁড়িয়ে যায় ফসল-ভিটে-মাটি। তারপর শাস্ত হয় নদী। খেতের জল শুকোয়, কিন্তু ক্ষত আর শুকোয় না। মাঠ হাঁ করে থাকে বড়ো বড়ো গহৰারে। স্বর্ণপ্রসূ মাটির ওপর স্তুপাকার হয় বন্ধ্যা বালি।

তাই চলিশ বছর ধরে একলক্ষ বিঘেরও বেশি জমি অনাবাদী পড়ে আছে। ন-টা ইউনিয়নের দেড়শোরও বেশি প্রাম, প্রায় একলক্ষ মানুষের ক্ষেতখামার, ঘরবাড়ি বারবার বন্যায় ভেসে যায়।

পশ্চিমে সাতকাহনিয়া থেকে পুরে সাগিরা পর্যন্ত একটানা চলিশ মাইল অজয়ের বন্যারোধী বাঁধ। এটা যেন অজয় অঞ্চলের ভাগ্যেরখে। যেখানে ঢিঁ খাবে, সেই পথেই সর্বনাশ। এর মধ্যে সাতকাহনিয়া থেকে সাগরপুতুল পর্যন্ত বাঁধটুকুই মাত্র সরকারি তদারকির মধ্যে পড়ে। এই অংশটুকুর মধ্যে বাঁধ যদি কোথাও ভাঙে, মেরামতের ভার সরকারে। সরকারের দরদ মানুষের জন্যে নয়, রেললাইনের কিছু না হলেই হল। বাঁধের বাকি অংশ ভাঙলেও, হাজার হাজার মানুষ দুর্ভিক্ষে মরলেও সরকারের যায় আসে না।

বাঁধের যে জায়গাগুলো নদী ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তাকে বলে হানা। সাগরপুতুল থেকে সাগিরা পর্যন্ত চার-চারটে হানার সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলো বাঁধতে না পারলে গোটা অজয় অঞ্চল ছারখার হয়ে যাবে।

তাই অজয় অঞ্চলের মানুষ বছরের পর বছর ধরে হানা বেঁধে দেবার জন্যে সেচবিভাগের কাছে বহু আবেদন-নিবেদন করে এসেছে। কোনোই ফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা প্রামের সমস্ত মানুষকে ডেকে নিজেরা তিরিশ হাজার টাকা তুলে বাঁধ মেরামত করল। অনেকেই বিনা মজুরিতে এসে খেটে দিল, গাঁয়ের লোক চাঁদা তুলে তাদের খাওয়াল। সে আজ প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা।

কিন্তু এবার হানা শুধু একটা নয়। আর এতগুলো হানা ভরাট করে বাঁধ বাঁধতে হলে লক্ষ লক্ষ টাকার দরকার। তাই সরকারকে রাজি করাতেই হবে। গ্রামে গ্রামে চলল মিটিং, শহরে দল বেঁধে গিয়ে হাকিম আর উজিরদের ঘেরাও করা হলো। শেষ পর্যন্ত বর্ষার ঠিক মুখে সরকারকে রাজি করানো গেল।

আর কয়েকদিনের মধ্যে বাঁধের কাজ শেষ করতে না পারলে বন্যায় আবার সব ভেসে যাবে। গাঁয়ের লোক হাপিত্যেশ করে আছে কবে ঠিকেদার আসবে, বাঁধের কাজ শুরু হবে।

শেষ পর্যন্ত দলবল নিয়ে একদিন ঠিকেদার এল পুরুচার হানা দেখতে। ঠিকেদার অবাঙালি, সন্তুত মাড়োয়ারি। খবর পেয়ে ঠিকেদারের তাবুর সামনে দু-পাঁচটা গ্রামের হাজার হাজার লোক উদ্ঘীব হয়ে ছুটে এল।

ঠিকেদার তাদের জিজ্ঞেস করল, ‘বাঁধ কিসকো বোলা যাতা হ্যায়?’

শুনে তো সকলের চক্ষুমিথি। যে লোক বাঁধ কাকে বলে জানে না, সে এসেছে বাঁধ বাঁধতে। বাঁধে হাত দেবার আগে গাঁয়ের লোক মাথায় হাত দিয়ে বসল। কিন্তু তীরে এসে যাতে তরি না ডোবে, তার জন্যে সবাই কোমর বেঁধে লাগল। বাঁধ নিজেদের চেষ্টাতেই তুলতে হবে।

পুরুচার প্রামে এসে দেখি যেন কুরুক্ষেত্র। প্রামের মধ্যে আর বাঁধের ধারে অসংখ্য শিবির—বেনাঘাসের ছাউনি দেওয়া বাঁশের টোল। বিউগল আর ব্যান্ড বাজছে—বেলুটি থেকে এসেছে ব্যাঙ্গের পার্টি। সাঁওতাল, বাগদি, বাউড়ি—অসংখ্য লোক কোদাল হাতে করে মাটি কাটছে। মেয়েরা ঝুড়ি হাতে করে লাইনবন্ডি দাঁড়িয়ে আছে। মাটির চাপে চাপে উঁচু হয়ে উঠছে বাঁধ। উঁচু হবে চার মানুষ সমান।

বন্যার দেশ বর্ধমান। বছর তিন-চার আগের এক বন্যার কথা মনে পড়ে গেল। সেবার খেপেছিল অজয় নয়, দামোদর। বর্ধমান শহর থেকে মাইল দশেক উত্তরে। জি টি রোডের ওপরে দাঁড়ালেও পায়ের গোড়ালি ডুবে যায়। আশপাশের নীচু জমিতে খড়ের চালাগুলো সব জলের নীচে।

সেই প্রথম বন্যা দেখলাম। আমি আর সুনীল জানা। আমি গিয়েছি খবর আনতে, সুনীল জানা ফোটো তুলতে। সাংবাদিকতায় দুজনের প্রথম হাতেখড়ি। সঙ্গে রাস্তা বাতলাবার জন্যে আছেন ডাক্তার শরদীশ রয়।

যেতে হবে আরও মাইল চার-পাঁচ দূরে। একেবারে হানার মুখে। মওকা বুঝে নৌকো জুটেছে অনেক। তিনগুণ চারগুণ ভাড়া। পকেটে আমাদের যা রেস্ত—তাতে শুধু যাওয়াই যায়, ফেরা যায় না।

এমন সময় গেরুয়া বসনে দেখা দিলেন উদ্ধারকর্তা। সঙ্গে তাঁর একপাল চেলাচামুঞ্চ। হাতে তাদের প্রকাণ্ড এক ফেস্টুন। তাতে কোন এক বৈয়ুব মিশনের নাম লেখা। বাবাজিকে বেশ একটা প্রমাণ সাইজের প্রণাম জানিয়ে শরদীশ ডাক্তার বললেন, আমাদের উদ্ধার করুন।

মিশনের দু-দুটো নৌকো আগে থেকে বায়না দেওয়া ছিল। নৌকোয় ততক্ষণে চিঁড়েগুড়ের বস্তাগুলো উঠে গেছে। ওগুলো বানভাসি গাঁয়ের লোকদের জন্যে। তাছাড়া আছে ডজন কয়েক পাঁউরুটি, কয়েক টিন মাখন আর দু-হাঁড়ি সন্দেশ। মিশনের কর্মীদের জন্যে।

বাবাজি এতক্ষণ মুখে আকাশছোঁয়া বৈরাগ্যের একটা ভাব নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন। মালপত্তরের দিকে মাঝে মাঝে একটু আড়চোখে নজর রাখছিলেন। মালপত্তর সব উঠে গেলে পর তিনি শরদীশ ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে ঘাড় হেলিয়ে জানালেন তথাস্তু।

পাছে পায়ে কাদা লাগে সেইজন্যে বাবাজিকে পাঁজাকোলা করে তোলা হলো নৌকোয়। খানিকটা যাওয়ার পর যখন চারিদিকের ডাঙা একদম মুছে গেল, তখন নড়েচড়ে গান ধরলাম আমরা—স্বদেশি গান। বিরস্ত হয়ে বাবাজি মুখ ঘূরিয়ে নিলেন অন্যদিকে। নৌকোর নীচে জল ঘূলিয়ে উঠছে, ডুবন্ত তালগাছগুলোর দিকে তাকালে বেশ বোঝা যায় মিনিটে মিনিটে জল বাঢ়ছে। গতিক সুবিধের নয়। বাবাজি আমাদের ধর্মকে থামিয়ে দেবেন, সে উপায়ও নেই। মুখ দিয়ে তাঁর কথা সরছে না। কমবয়সি চেলাদের সে-গান ভালো লাগবাবাই কথা।

অনেকখানি যাবার পরে দূরে প্রাম দেখা গেল। নৌকো যাবে না অত দূরে। জলে ডুবে থাকলেও মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা চড়া। কাজেই হেঁটে যেতে হবে।

মিশনের ছেলেরা চিঁড়েগুড়ের বস্তা আর পাঁউরুটির ঝুড়ি কাঁধে নিয়ে পা টিপে পা টিপে গাঁয়ের দিকে এগোতে লাগল। বাবাজিকে আমরা বললাম—আপনি থাকুন নৌকোয়। কেন আর কষ্ট করে যাবেন?

বাবাজি নাহোড়বান্দা। দূর থেকে বস্তা আর ঝুড়ির দিকে একবার করে আড়চোখে চান আর উদাস হয়ে বলেন—আহা হা, কেষ্টের জীবগুলোকে না দেখলে হয়? কী কষ্টেই না পড়েছে।

বাবাজিকে নিয়ে যেতে চেলাচামুঞ্জাদেরও ইচ্ছে ছিল না। ওই লাশ তো তাদেরই কাঁধে ভর করবে। কিন্তু লাশ শেষ পর্যন্ত বহিতেই হলো।

সারাটা দিন ঢিঁড়েগুড় বিলি হলো। ওদের সন্দেশ-পাঁড়িরুটিতে বেশ মোটা ভাগ বসিয়ে আমরা তিনজন সারা গাঁ ঘুরে দরকারি খবর আর ফোটো জোগাড় করতে বেরোলাম। সন্ধের ঠিক আগে নৌকো যখন ছেড়ে দিয়েছে, হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আমরা চলস্ত নৌকোয় উঠে বসলাম। আমাদের দেখে বাবাজি মুখটা কালো করলেন।

খানিকটা যাবার পর বালির চড়ায় নৌকো গেল আটকে। সবাইকে নামতে হলো। নৌকো ঠেলে নিয়ে যেতে হবে। বাবাজিরও এবার না নেমে উপায় নেই। নৌকো ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে হঠাত পেছনে একটা আর্তনাদ শোনা গেল—‘গেলাম, গেলাম’। তাকিয়ে দেখি বাবাজি প্রাণপণে হাত তুলে চেঁচাচ্ছেন। চোরাবালিতে তাঁর হাঁটু অবধি ডুবে গেছে। আর সুনীল জানা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে জলের মধ্যে পড়ে যাওয়া তার ক্যামেরাটা তুলতে তুলতে বলছে— ভগবানের নাম করুন।

সবাই মিলে অনেক কষ্টে বাবাজিকে চোরাবালি থেকে টেনে তোলা হলো।

কিন্তু নৌকোয় উঠে বাবাজির দিকে তাকিয়ে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। বাবাজি একদম বদলে গেছেন। তাঁর চোখ আর চুলু চুলু নয়। রসকয়ও তাঁর বেশ আসে। আটপৌরে মানুষ যেমন হয় তেমনি।

এতক্ষণে আমাদের জিজ্ঞেস করলেন—মহাশয়দের নিবাস? আমরা বললাম। আবার জিজ্ঞেস করলেন—মহাশয়দের কী করা হয়? তাও বললাম। শুনে তিনি যা মন্তব্য করলেন তা থেকে বুবালাম বাবাজি ‘শনিবারের চিঠি’ও পড়েন।

পুরুচার বাঁধের কাছে বসে সেই পুরোনো দিনটার কথা ভাবতে ভাবতে একমাত্র আস্ত জানা গান ‘বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, ভা—ঙে’ গাইছি, এমন সময় পিঠের ওপর একটা প্রচণ্ড কিল পড়ল। ফিরে তাকিয়ে দেখি বিজন ভট্টাচার্য, সঙ্গে শস্ত্র মিত্র।

‘এই কী হচ্ছে? বর্ধমানে ও-গান বেআইনি জানো না?’

এতক্ষণ আমার খেয়ালই ছিল না। কী সর্বনাশ। কী সর্বনাশ। লোকে শুনলে তো বাঁধের নীচেই আমাকে জ্যাস্ত মাটিচাপা দিত।

সারাটা দিন চলে বাঁধ বাঁধার উৎসব। সবাই কোনো-না-কোনো কাজে হাত লাগিয়েছে। একটা জায়গায় বেশ ভিড় জমে গেছে। ব্যাপারটা কী?

গিয়ে দেখি কোদাল হাতে হায়াত সাহেব মাটি কাটছেন। আর সেই মাটি ঝুড়িতে করে মাথায় তুলে বাঁধের ওপর ফেলে দিয়ে আসছেন সেন্টদুদ্দিন সাহেব। একজন যেমন মশার মতো রোগা আর একজন তেমনি মোয়ের মতো মোটা। ছোটো ছেটো ছেলেরা হাততালি দিয়ে হাসাহাসি করছে। দুজনেই এ অঞ্চলের গণ্যমান্য লোক। অনেক দিনের জেলখাটা স্বদেশি। কৃষক সমিতি এমন মানীগুণী লোকদেরও হাতে কোদাল আর মাথায় মাটির ঝুড়ি দিয়ে কাজে নামাতে পেরেছে দেখে গাঁয়ের চাষিদের ভারি ফুর্তি।

বিকেলে মুষলধারে বৃষ্টি। কিন্তু তার জন্যে মিটিং কেন ঠেকে থাকবে? দূর দূর থাম থেকে লাল নিশান উড়িয়ে এল একটার পর একটা মিছিল। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কুচকাওয়াজ করতে করতে আসছে

একটার পর একটা সৈন্যবাহিনী। দেখতে দেখতে বাঁধের নীচে ছ-সাত হাজার লোকের ভিড় জমে উঠল। শহর থেকে ভাড়া করা মাইক এসেছে। গোটা তল্লাট গম গম করছে তার আওয়াজে। নদীর ওপারের থামগুলোতেও সভার ডাক পৌঁছুবে।

সন্ধেবেলা গানের জলসা বসল সমিতির শিবিরে। গায়কেরা বসলেন উঁচু মাটির দাওয়ায়। সেটাই হল রঙগমণ্ড। সামনের উঠোনে জলকাদার মধ্যে উবু হয়ে হয়ে বসল শ্রোতার দল। কয়েক হাজার হবে।

বাঁধ নিয়ে গান বেঁধেছে গাঁয়ের চাষিরা। তাদের এতদিনের দুঃখের পালা এবার তারা নিজের হাতে চুকিয়ে দেবে, এই একটি আবেগ তাদের সবাইকার গানে। সেই সঙ্গে কলকাতা থেকে এসেছেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের দুজন সেরা শিল্পী—বিজন ভট্টাচার্য আর শঙ্কু মিত্র। গাঁয়ের লোকে জমজমাট জলসা অনেকদিন শোনেনি।

জমিদারবাড়িতে পূজাপার্বণে কিংবা বিয়েসাদির সময় আগেকার আমলে শহর থেকে নাম করা গাইয়ে-বাজিয়েদের বায়না দিয়ে আনা হয়েছে বটে, কিন্তু তারা কখনও তাদের গানে চাষিদের কথা বলেনি। যতটুকু যা বলেছে, তাও হাসিমশকরা করার জন্যে। সে সব গাইয়েদের ঢংঢংও লোকের ভালো লাগেনি।

কিন্তু সমিতি যাদের এনেছে, তারা কিন্তু ভারি সাধাসিধে। প্রথমটা তো তারা বুঝতেই পারেনি। ভেবেছিল হয়তো কমিটির লোক হবে। গান শুনে তবে বুঝল লোকগুলো যে সে নয়, গানবাজনায় ওস্তাদ। আর কী গান। চাষিদের মনের কথা গাইয়ে বাবুরা জানল কেমন করে?

সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরও বাঁধের মজুরুরা অনেক রাস্তির পর্যন্ত ঠায় উবু হয়ে বসে গান শোনে।

জীবনে তাদের এ-অভিজ্ঞতা এই প্রথম। লোকে হালগোরুর মতো পয়সা দিয়ে খাটিয়ে নেয়, চোখ রাঙ্গায়। তাই ফাঁকি দিতে পারলে তারা ছাড়ে না। আর এখানে এসে তারা শুনল—তাদের হাতে নাকি ন-টা ইউনিয়নের জীবনমরণ। তারাও তো এই বন্যার অভিশাপেই আজ নিঃস্ব। ভাঙ্গা চাল ছাইবার জন্যে একমুঠো খড় পায় না। খড় পাবে কোথায়? ধানের জমিগুলো বন্যায় ভেসে যায়। ছেলেমেয়েরা সারাটা শীত ঠকঠক করে কঁপে। তারপর ম্যালেরিয়ায় জীবনান্ত হয়। গাঁ ছেড়ে দলে দলে লোক তাই দেশান্তরী হচ্ছে। চাষ-আবাদ ছেড়ে লোকে শহরে গোলামি করতে ছুটছে।

বাঁধ বাঁধা হচ্ছে শুনে গাঁয়ের বড়োলোকেরা তাই এবার পুরু কাটাবার জন্যে, বাগান করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। তারা গাঁয়ের দিনমজুরদের বেশি মজুরির লোভ দেখিয়েছিল। তবু তারা গাঁ ছেড়ে বাঁধ বাঁধতে এসেছে। বাঁশের টোলে জল পড়ে, চিঁড়েমুড়ির ব্যবস্থা নেই, মুনশিরা চুয়োর ঠিকমতো মাপ নেয় না—ঠিকেদারদের শত দুর্ব্যবহার সহ্য করেও তারা আছে।

তারা চোখের ওপর দেখছে এই গাঁয়েরই গরিব চাষি ব্রজেশ্বর গড়াই মাটি কাটার জন্যে তার নিজের জমি, ভলান্টিয়ারদের জন্যে তার নিজের ঘর ছেড়ে দিয়েছে। বিনা মজুরিতে সে সকলকে রেঁধে খাওয়াচ্ছে।

সান্তার সাহেব নিজের খরচে ইউনিয়নের কর্মীদের জন্যে আলাদা তাঁবু ফেলেছেন।

মাথার ওপর খাঁড়ার মতো বুলছে উদ্যত বর্ষা। ছেটানাগপুরে পাহাড়ের জটায় জটায় এখন বন্দি হয়ে আছে দু-চারটি দিনের বৃষ্টির জল। জটার বাঁধন খুলতেও বেশি দেরি নেই। জঙগল-পাহাড় ভেঙে কবে দুরন্ত ঢল নামবে কে জানে? ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে অজয়ের দুই তীরের মানুষ।

পুরুচার মানুষগুলো কিন্তু অজয়ের চোখে চোখ রেখে উঠে দাঁড়িয়েছে। অদৃষ্টের লিখনকে তারা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে নিজেদের হাতে নিজেদের ভাগ্য রচনা করার ভার নিয়েছে।

তারা হেঁকে বলছে, দেখো—

আকাশে মেঘের ঘনঘটার সঙ্গে পান্না দিয়ে বাঁধ উঠছে, দেখো—চার মানুষ সমান উঁচু বাঁধ।



## শালমতুয়ার ছায়ায়

মেদিনীপুর শহরের ওপর দিয়ে পাকা সড়ক গেছে পুর থেকে পশ্চিমে—বাঁকুড়া আর রানিগঞ্জ থেকে কটক আর বালাসোরের দিকে। এই রাস্তায় যদি কখনও এসে দাঁড়াও দেখবে এপারে-ওপারে দুখানা হয়ে আছে মেদিনীপুর জেলা।

ওপারে মাকড়া পাথরের টেউ-খেলানো মাঠজমি। দুধারে অনুর্বর উঁচু জমির মাঝাখানে ছোটো ছোটো খোয়াই—সেখানে বোনা হয় ধান আর কলাই। মাঠজমি পেরিয়ে বড়ো বড়ো শাল-মতুয়ার গাছ, বিশাল অরণ্য। আর এপারে পলি পড়া সমতল, নদীনালার কোলে দিগন্তচোঁয়া সবুজ ফসল আর মুখরিত গ্রাম। ওপারের বায়ুকোণে ছোটনাগপুরের পাহাড়তলী; এপারের অগ্নিকোণে বঙ্গোপসাগর। ওপারে সাঁওতালদের সন্তুষ্টি; এপারে তান্ত্রিক আর নগর চন্দ্রকোণ। ওপারে জঙ্গলমহাল, এপারে ক্ষেতখামার।

কেশপুর থেকে হাঁটা রাস্তায় চলেছি শালবনীর দিকে। যেতে যেতে মাটির রং বদলায়। পারুলিয়া, শীর্ষা, পারকোলে পার হয়ে বনের ভেতর দিয়ে রাঙ্গা মাটির রাস্তা। তেঁতুলমুড়ির বন পেরিয়ে মহিয়ড়ুবির বন। মাঝাখানে ছোটো ছোটো জনবিরল গ্রাম—ওপর সাতশোল, মধ্য শাতশোল, নীচু সাতশোল। বনের মধ্যে সরু সরু বারনার নদী। কাঠের বেড়া দেওয়া ছোটো ছোটো কুঁড়েঘর। রাস্তায় দু-চারটে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। আর জনমনুয় নেই।

পায়ের নীচে উঁচু-নীচু শক্ত পাথুরে মাটি তেতে আগুন হয়ে আছে। বিশাল বন, কিন্তু কোথাও এতটুকু ছায়া নেই। দুপাশে শুধু লতাপাতা। ক্লান্ত মানুষকে ছায়া দিতে পারে এমন গাছ নেই। যুদ্ধের ঠিকেদাররা যা পেয়েছে সব চেঁচেপুঁছে নিয়ে গেছে।

যুদ্ধে কাঁচা শালকাঠি বেচে এরা লাল হয়ে গেছে। তবু এদের লালসা মেটেনি। চারাগাছগুলো পর্যন্ত এরা কেটে সাফ করেছে। আর কিছুদিন এভাবে চললে মেদিনীপুরে বনজঙ্গলের আর চিহ্ন থাকবে না। এভাবে জঙ্গলবাড়াই আজ নতুন নয়; গত ঘাট-সন্তর বছর ধরে ব্যাবসাদাররা খানকার বনজঙ্গল থেকে নির্বিচারে কাঠ কেটে কলকাতায় চালানি কারবার চালাচ্ছে। যুদ্ধের মধ্যে স্টেটই আরও তীব্র আকার নিয়েছে। স্টেশনে সাজানো কাঠের স্তুপগুলো দেখলে দূর থেকে ছোটো ছোটো টিলা বলে ভুল হয়।

এর সর্বনাশ ফলতে শুরু করেছে। কেশপুর থেকে ঘাটাল পর্যন্ত মাইলের পর মাইল সেই দৃশ্যই দেখে এলাম।

চারিদিকে খরা-লাগা মাঠজমির ফুটিফাটার মতো অবস্থা। একফোঁটা বৃষ্টি হবে কোথা থেকে? বৃষ্টির যারা উৎস, সেই বনজঙ্গলগুলোই যে সাফ হয়ে যাচ্ছে।

মেদিনীপুর থেকে কেশপুর বাসে আসতে একেবারেই ভিড় ছিল না। বাসের কন্ট্রাক্টর দুঃখ করে বলল, বাজার বড় খারাপ পড়েছে, বাবু; বাসে আর প্যাসেঞ্জার পাই না। অন্য অন্য বছর এ সময়টাতে লোকে বুলতে ঝুলতে যায়। রাস্তার মাঝখান থেকে লোক নেওয়ার আর জায়গা হয় না। অন্য অন্য বছর এতদিনে চাষবাস সব সারা। গাঁয়ের লোক জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে শহরে যায়। মামলা-মোকদ্দমারও ধূম পড়ে। তাই বছরের ওই সময়টা বাসওয়ালাদের মরশুম।

কিন্তু এবার বৃষ্টির অভাবে কেউ চাষবাস করতে পারেনি।

রাস্তার দুপাশে তাকিয়ে দেখলাম, কোথাও সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। মাঠে মাঠে জলে যাওয়া হলুদবর্ণ ধান। পৃথিবীর সারা অঙ্গ যেন আগুনে ঝালসানো।

শহরে গ্রামে সকলেরই মুখে আতঙ্কের ছাপ। পঞ্জাশ সালে তবু তো মাঠে ফসলের আশা নিয়ে চাবিরা দুর্ভিক্ষের দুটো মাস শাকপাতা খেয়ে কোনো রকমে কাটিয়ে দিয়েছিল। এবার একটা নয়, দুটো নয়—সামনের পনেরোটা মাস ফসল পাবার কোনো লক্ষণ নেই। মানুষ কী করে বাঁচবে? শহরের চায়ের দোকানে, ডাক্তারখানায়, কোর্টকাছারির বটতলায়—সকলেরই মুখে এক কথা। মানুষ কী করে বাঁচবে? গাঁয়ের চাষি যদি মরে, শহরের উকিল, ডাক্তার, দোকানির পেটেও যে টান পড়বে।

ধৰংস আর মৃত্যুর সেই করাল মূর্তি দেখেছিলাম তিন বছর আগে। তমলুক মহকুমায়।

মহিযাদলে যাবার রাস্তায় শ্মশানের পর শ্মশান। ফাঁকা ফাঁকা মাঠ; মাঝখানে পড়ে আছে অসংখ্য নতুন মাটির কলশি। লোকে বলল, শ্মশানগুলো সবই নতুন হয়েছে। আগে ধানচাষ হতো এইসব জমিতে। দু-দিন আগে এলে দেখতেন না-খেয়ে মরা মানুষগুলো বাড়ির উঠোনে উঠোনে পচে ভেপসে উঠেছে, তাদের লাশগুলো শেয়াল আর শকুনিতে ছিঁড়ে থাচ্ছে। মাঠে নিয়ে গিয়ে মড়া পোড়ানোর কারো সামর্থ্য ছিল না।

খালের ধারে এসে হঠাৎ আঁতকে উঠেছিলাম। দুপাশে বাঁধের গায়ে সারবন্দি কঙ্কাল। মাথার খুলি আর পাঁজরের হাড়গুলো এমনভাবে ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে যে দেখে মনে হয় যেন তারা পরস্পরে ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে যেতে চাইছে।

রাস্তার দুপাশে গায়ে গা-দিয়ে রয়েছে একটানা অনাবাদি জমি। রোদুরে চোখ চাওয়া যায় না। মাঠে কঢ়ি কদাচিৎ গোরু চোখে পড়ে। আগে নাকি গোরুতে গোরুতে সাদা হয়ে থাকত সবুজ মাঠ।

সুতাহাটির রাস্তায়ও সেই একই দৃশ্য। রোদুরে সাদা সাদা হাড়পাঁজর চিক চিক করছে খালের দুধারে। এক গেলাস জল খাবার জন্যে হাতিবেড়া গ্রামে চুকে কোনো বাড়িতেই ডেকে ডেকে কারও সাড়া পেলাম না। অনেক হাঁকডাকের পর এক বাড়ি থেকে জুরে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল এক বুড়ো। দেখলাম বুড়োর হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছে। বুড়ো বলল, জল গড়িয়ে দেবারও লোক নেই কেউ। ভেতরে এসে নিজেই নিয়ে খান।

বুড়োর আপন বলতে কেউ নেই। এক ছেলে ছিল, সেও বিবাগী হয়ে কোথায় চলে গিয়েছে। গাঁয়েও আর কেউ নেই। সব উজাড় হয়ে গিয়েছে। যারা কোনো রকমে বেঁচেবর্তে ছিল, চাটিবাটি উঠিয়ে তারা গাঁ ছেড়ে পালিয়েছে। রানিচকেরও সেই একই কাহিনি।

চিরঞ্জীপুরে সনাতন মণ্ডলের বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলাম। সনাতনের ঠিক পাশেই তিন মাথা এক করে বেঞ্চের ওপর বসে একজন। গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে। দেখে মনে হলো সনাতনের দাদা। জিজ্ঞেস করলাম—আপনার দাদার কি জুর হয়েছে? সনাতন প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপরই বলল—দাদা নয় তো, ও আমার ছেলে। বছর কুড়ি বয়স হবে ওর। ভুগে ভুগে অমনি চেহারা।

গাঁ থেকে বেরিয়ে মনে হলো পালাতে পারলে বাঁচি।

চক-তাড়নায় এসে দেখি খালের দুধারে আবার সেই নরকঙ্কালের মিছিল। রাস্তায় একজন লোক আমার মুখের চেহারা দেখে বলল, এ আর কী দেখছেন! আগে যান, পুরুষ মানুষের মুখ দেখতে পাবেন না।

একটু এগিয়ে দেখি সত্যিই তাই। দুদিকে গ্রাম খাঁ খাঁ করছে। বিধবার রাজ্যে এসে পড়েছি যেন।

হলদি নদী পার হয়ে তেরোপাথিয়ার হাট। রান্নিরটা কাটাতে হয়েছিল পান্থশালায়। সরু সরু ছোট খাট জোড়া দিয়ে ফরাস পাতা ঢালাও তেলচিটে ময়লা বিছানা। খাটগুলো যেন ছারপোকার ডিপো। জঙ্গি বিমানের মতো একরোখা মশাগুলো গেঁত্তা খেয়ে গায়ের ওপর হুল বসিয়ে দেয়।

পান্থশালায় ফড়ে আর ব্যাপারীর ভিড়। ছারপোকা আর মশার কামড়ে ঘূম হয় না বলে সারা রাত হুঁকে টানতে টানতে তারা গল্পগুজব করে কাটিয়ে দেয়। শুয়ে শুয়েই ধানচালের দরদস্তুর করে, আর ফন্দি আঁটে কেমন করে বেশি দামে চালান দেওয়া যায়।

গেঁওখালির হাটে যা দেখেছি, তার কাছে তেরোপাথিয়া তো কিছুই নয়। বুপনারায়ণ আর গঙ্গা যেখানে এসে মিশেছে, সেখানটায় হাওড়া-চবিশ পরগনা-মেদিনীপুর তিন-তিনটে জেলার সীমানা। নদীর পাড়ে অসংখ্য ছোটো ছোটো জেলে ডিঙি। মাঝনদীতে বড়ো বড়ো নৌকা দাঁড়িয়ে। ছোটো ছোটো ডিঙিতে বস্তা বস্তা চাল উঠছে। তারপর ডিঙিগুলো ভরতি হলে সেই চাল গিয়ে জমা হবে বড়ো বড়ো নৌকোয়। জমাদার আছে, সেপাই আছে, ডজনখানেক হোমগার্ডও আছে। কিন্তু ছুঁচের ভেতর দিয়ে দিব্যি হাতি গলে যাচ্ছে। সরকারের আইন—একসঙ্গে বিশ মনের বেশি ধানচাল জেলার বাইরে যেতে পারবে না। যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে—তারই জন্যে এই অভিনব চোরাই ব্যবস্থা। গোলাদার আর পাইকারঠা ক্ষুধার্ত মানুষের মুখের ধাস ছিনিয়ে নিয়ে দুহাতে পয়সা লুটছে।

নদীগ্রামে গিয়ে শুনেছিলাম আধ্মন ধানের বদলে এক গরিব চাষি দিনকয়েক আগে এক বিদ্যা চাষের জমি বেচে দিয়েছে।

পুরুষোন্নতমপুরের কৃষ্ণদাস অগস্তির কথা আজও মনে হলে চোখে জল আসে। কৃষ্ণদাস ছিল ও অঞ্চলের কিশোর বাহিনীর সেরা নেতা। রোগা ছিপছিপে কালো চেহারা। চোখ দুটো টানা টানা। কোঁকড়া চুল। লাজুক

লাজুক মুখের ভাব। ভারি মিষ্টি স্বভাব। তোতলামির জন্যে এমনিতেই কথা কম বলত। বাড়ির অবস্থা ছিল খুবই খারাপ।

অভাবে অভাবে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণদাসের বাবার। একেই খাওয়া জোটে না, তার ওপর বাড়িতে অশান্তি। অভিমান করে চলে যাচ্ছিল কৃষ্ণদাস যেদিকে দুচোখ যায়। বেশিদূর যেতে পারেনি। পাশের গাঁয়ে এক জমিদার বাড়ির সামনে ঝোপের মধ্যে ভাঙা একটা পালকি পড়েছিল। না খাওয়ার দরুন শরীর টলছিল বলে সেই পাঞ্চির মধ্যে রান্তিরে আশ্রয় নিয়েছিল কৃষ্ণদাস।

এদিকে সারা গাঁয়ে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গিয়েছে। কৃষ্ণদাসকে সবাই ভালোবাসে। এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। পারদাটার লোকগুলো বলল—কই, কৃষ্ণদাস তো এদিকে আসেনি।

খুঁজতে খুঁজতে তিন দিন পর ভাঙা পালকির ভেতর থেকে কৃষ্ণদাসের লাশ পাওয়া গেল। গোটা গাঁয়ের লোক সে রান্তিরে ঘুমোয়নি।

পাঁশকুড়া থেকে বাসে যেতে সতেরো নম্বর ইউনিয়ন। আকালের বছরে সেখানকার দশ জন পিছু একজনকে যমের মুখে তুলে দিতে হয়েছিল।

পূর্বচিক্ষার রাস্তায় শুকুস্তলার বাঁধের ওপর দেখেছিলাম কঙ্কালসার মানুষের মিছিল। ছেঁড়া মাদুর, মাটির হাঁড়ি আর পেঁটুলা-পেঁটুলি মাথায় নিয়ে তারা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কেউ নাগপুরে, কেউ উড়িয়্যায়। গাঁয়ে ফসল উঠলে আবার তারা বাগ-দাদার ভিটেতে ফিরে আসবে। এখন তাদের একমাত্র চেষ্টা যাতে দিনকতক বেঁচে থাকতে পারে। যদি মরতেই হয়, ফিরে এসে ঘরের উঠোনে মরবে। পরে শুনেছি তাদের মধ্যে খুব কম লোকই প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিল।

দু-বছর পরে মেদিনীপুরে ফিরে এসে জলে-যাওয়া মাঠে মাঠে আবার সেই আকালের যেন আভাস পাচ্ছি। তমলুকের ‘পুওর-হাউস’। সেবার সব থেকে শেষে এসেছিল পরমানন্দপুরের অমূল্য পাত্র। সোনারুপোর কাজ করত সে। শেষ সোনাদানা বেচে দিয়েও যখন বাঁচতে পারেনি, তখনই সে ছেলে-বউয়ের হাত ধরে সরকারি ‘পুওর-হাউসে’ এসে উঠেছিল। এবার আকাল লাগলে দিনমজুর মাহিন্দারের সঙ্গে স্বর্ণকার অমূল্য পাত্রের কোনো তফাত থাকবে না। সবাই একসঙ্গে রসাতলে যাবে।

রোড চন্দ্রকোণা থেকে ঘাটাল পর্যন্ত বিরাট এলাকা জুড়ে রাস্তার দুপাশে ফসলের কোনো চিহ্ন নেই। শ্রাবণ গেল, ভাদ্র গেল, আশ্বিনও যায় যায়। বৃষ্টির আর কোনো আশা নেই দেখে চোখের জল মুছতে মুছতে চায়িরা বওড়া আর মুগ বসান, শুকনাশ আর মানুষমারির মাঠে গোরু ছেড়ে দিয়েছে। ধানের চারাগুলো একেবারে শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার চেয়ে বরং গোরুতেই খাক।

বরাবরকার বন্যা-অঞ্জলি বাঁকা, জলসরা আর ক্ষীরপাই। সেখানকার নীচু মাঠঘাট শুকনো ঠনঠন করছে। বাঁকা নদীর ওপর দিয়ে লোক হেঁটেই পারাপার করছে। পুকুরগুলো এরই মধ্যে শুকিয়ে গেল। লোকে দু-দিন পর তৃঝার জলও পাবে না।

গাঁয়ে গাঁয়ে মজুরেরা বেকার। কারো জমিতে ফসল নেই, খাটাবে কে? তাই তারা গাঁ থেকে চাটিবাটি উঠিয়ে ছেলে-বউ নিয়ে দক্ষিণের দিকে চলেছে। একবার কপাল ঠুকে দেখবে যদি কাজ পাওয়া যায়।

এদিকে জমিদারদের কাছারিগুলো আবার সরগরম হয়ে উঠছে। ফসল হোক না হোক, আশ্চিন কিস্তির খাজনা তারা আদায় করে ছাড়বে। তারই জন্যে নায়েব গোমস্তারা ছুরি শানাচ্ছে।

সাঁওতালরা পথে বেরিয়েছে। জঙগল গিয়ে তাদেরও ভেঙেছে শাস্তির নীড়। বন নেই, শিকার নেই—কী নিয়ে আর থাকবে? দু-চারজন আজও মায়া কাটাতে পারেনি, তাই আজও বনের মাটি কামড়ে পড়ে আছে। সন্ধেবেলায় নির্জন বনে শুধু তাদেরই নিঃসঙ্গ মাদল বেজে ওঠে।

সাঁওতালরা কাজ নিয়েছে শালবনীর পাশেই ঝাড়ভাঙা ডিগারির বিমানঘাঁটিতে। কেউ কেউ নামালের দিকে চলে গেছে পরের জমিতে খাটখাটি করতে। বন থেকে অনেক দূরে শহরের পাশে বসেছে সাঁওতালদের নতুন আস্তানা। সন্ধে হলে তেমনি মাদল বাজায়, কিন্তু ট্রেনের বাঁশিতে আর ট্রাকের শব্দে গানের সুর দুরে যায়।

শহরের ধূলিধূসর শ্রমিকজীবনে তারা এক নতুন আস্তাদ পেয়েছে। যন্ত্র তাদের জাদু করেছে। বিরাট যন্ত্রান্বিত চোখের পলকে আকাশে উড়ে যায়; একটা বুলডোজার একা পাঁচশো মানুষের সমান কাজ করে। পিচালা রাস্তা দিয়ে সাঁওতাল মেরেদের নিয়ে মিলিটারি ট্রাক হাওয়ার বেগে ছুটে যায়। ফুর্তিতে তারা গেয়ে ওঠে সাঁওতালি ঝুমুর। নতুন জীবন নিয়ে তারা গান বাঁধে :

ধানকলের বাঁশি বাজছে  
যেতেও তো হবে অনেকখানি রাস্তা।  
আর তো জঙগল নেই যে ফুল ফুটে থাকবে;  
আর তো ফুল নেই, তোর খোঁপায় বেঁধে দেবো।  
আর তো শিকার নেই যে মাদল নিয়ে বনে বনে ঘুরবি।  
আর আমরা পাব ধানকলে যাবার ছুটি।  
কদু ঘাসও তো শুকিয়ে গেছে,  
কদুর মূলও তো ফুরিয়ে গেছে  
ফিরে এসে কী খাবি?  
চল, ধানকলেতে চল।

মাদল বাজিয়ে তারা গায় :

মিলিটারি এল।  
মিলিটারি আসার ফলে এক টাকার জিনিস হলো তিন টাকার।  
এখন আর কাজের ভাবনা নেই—  
আর নামাল দিয়েও খাটতে যেতে হবে না।  
পারকুলোর বদলে এখন ধান পাব—ধান।  
যাবার আসবার ভাবনা নেই  
খাটবারও আর ভাবনা নেই  
জঙগল হয়ে উঠেছে শহর।  
হাওয়াই জাহাজের চিকারে আর গোলমালে  
ঘুমোনোও হয়ে উঠেছে দায়।

আমাদের কলমা সাঁওতালনি  
 তার মাথায় উঠেছে তেল।  
 খোঁপাতে আবার ফুল গুঁজেছে  
 কোথেকে পেল কে জানে?  
 এখন গাঁয়ের মধ্যে চাল পাবি না  
 পাবি রোডে।  
 তাও চাল নয়,  
 পাবি ভাত—গরম ভাত।  
 কাজ খুব, কিন্তু তবু তো কাজ।  
 হাতেও তো কিছু করলি।  
 তবে দেখিস ভাই, ট্রাকের নীচে পড়িস না।

শাল-মহুয়ার বন উজাড় করে মিলিটারির ছাউনি পড়েছে মাইলের পর মাইল। ঝাড়ভাঙায় তা দেখেছি, দেখলাম সরডিহায়। যে অঞ্চলে মিলিটারি, সে অঞ্চলে বদলে গেছে গাঁয়ের চেহারা। কাঁচা রাস্তা পাকা হয়েছে। গাঁয়ের আকাশ ধূলোয় ধূলো হয়ে থাকে লরির চাকায়। যেখানে দোকান ছিল না, সেখানে দোকান, যেখানে ঘর ছিল না, সেখানে পাকা দালান উঠেছে। গাঁয়ে এতদিন যারা ফ্যা ফ্যা করে ঘুরত তাদের মধ্যে একটু করিতকর্মা লোক যারা—তারা ঠিকেদারি করে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে। পাঁচ আঙুলের চার আঙুলে এখন তাদের হি঱ে বসানো আংটি। গায়ে আদির পাঞ্চাবি। পায়ে রংচঙ্গে নাগরা। কেউ কেউ চোখে বিনা পাওয়ারের চশমা লাগিয়ে দোকানে উলটো করে কাগজ ধরে দেখায় কত পড়েছে।

কাছেই খড়কডিহা প্রাম। তেমাথায় একটা ফলারের দোকান। চা-ও পাওয়া যায় সেখানে। পাট-ভাঙা টকটকে লাল-পাড় শাড়িপরা একটি মেয়ে সেই দোকানের মালিক। দেখে মনে হয় এই গাঁয়েরই মেয়ে।

অনেকক্ষণ থেকে ভাবছিলাম এ অঞ্চলের একজন পুরোনো কংপ্রেস নেতৃীর কথা জিজ্ঞেস করব—তিরিশ সালে সারা বাংলাদেশ যাঁর নাম শুনেছিল। চা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম—‘আচ্ছা, বীরকন্যার কী খবর?’ এদিককার লোকের দেওয়া নাম বীরকন্যা।

উত্তরে যা পেলাম গরম চায়ে আমার মুখ পুড়ে যাবার যোগাড়। ফলারের দোকানের মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে বলল, ‘সে অনেক হিস্ট্রি, মশাই।’ হিস্ট্রি কথার মানেটা জানা থাকলেও, কথাটা এমন একজনের মুখ থেকে শুনলাম যে, নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। পরে যখন দেখেছিলাম গোরু চরাতে চলাতে রাখাল ছেলেরা একজন আর একজনকে ‘হ্যালো জনি, হ্যালো জনি’ বলে ডাকছে, তখন বুরোছিলাম গোরা পল্টনরা এসে গাঁয়ের লোকের মুখে দো-আঁশলা শব্দ যুগিয়েছে। কিন্তু বীরকন্যার খবর জিজ্ঞেস করেও আর কিছু পাওয়া গেল না।

মাথায় তখন একটা বুদ্ধি এল। ঠিক করলাম একজন নাপিত ধরতে হবে। নাপিতরা সব দেশেই লোকের হাঁড়ির খবর রাখে। খুঁজতে খুঁজতে স্টেশনের কাছে একজনকে পাওয়া গেল। চুল ছাঁটতে বসে গেলাম। যা আন্দাজ করেছিলাম তাই। গাঁয়ের সমস্ত খবর তার নখদর্পণে।

যা জানতে পারলাম তা এই—

বীরকন্যাকে আজ আর কেউ বীরকন্যা বলে না। আজ সে মিলিটারির ঠিকেদার। তিরিশ সালে জেল থেকে আসার পর জেলে সে আরও অনেকবার গেছে। কিন্তু স্বদেশি করে নয়, ফৌজদারি মামলায়। এ গাঁয়ে সে করে কেমন করে এসেছে কেউ জানে না। শোনা যায়, সে নাকি ভিনগাঁয়ের ধোপার মেয়ে। এ গাঁয়ে মাহাতোদের ঘরেই সে মানুষ। মাহাতোরা নাকি সাঁওতালদের চেয়ে একটু উচু জাত। তিরিশ সালের ঢেউ এ-গাঁয়ে এসে যখন লাগল, তখন সকলের আগে তিনরঙা নিশান নিয়ে দাঁড়িয়েছিল গাঁয়ের এই বাপ-মা মরা মেয়েটা। চোখে তার আগুন জুলে উঠেছিল, আর সেই আগুনে জাগিয়ে তুলেছিল সে ঘূমস্ত গোটা তল্লাটকে। হাজার মানুষের যে ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে উঠেছিল, দৃঃখ্য-পোড়া মেয়েটাই হলো তার অধিনেত্রী। মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল তার নতুন নাম বীরকন্যা। সারা তল্লাটে সেদিন বন্দেমাত্রম ছাড়া আওয়াজ নেই। মুক্তিপাগল মানুষের সেই উদ্বাস্ত মিছিল হারিয়ে গেল বন্দিশালায়। জেলের কষ্টকে কেউ কষ্ট বলে মনে করেনি। কষ্ট হয়েছিল স্বদেশি বাবুদের দেশে। তাঁরা চাষিদের দিকে ফিরেও তাকাতেন না। তারা যেন মানুষই না। বাবুরা বলেছিলেন, জেলে গেলে দেশ স্বাধীন হবে। জেলে তো তারা হাজারে হাজারে গেল, দেশ তো কই স্বাধীন হলো না! জেল থেকে ফিরে ক-বছর কী কষ্টেই না দিন গেছে। বাবুদের আর টিকি দেখা যায়নি। দেখা গেল ভোটের আগে। বাবুরা বললেন—কংগ্রেসকে ভোট দিলেই এবার দেশ স্বাধীন। ভোট তারা দিয়েছে, তবু দেশ তো স্বাধীন হয়নি। বড়োলোকেরা কেবল গরিবদের এমনি করে ঠকিয়ে এসেছে। অন্ধ রাগ আর তাদের দিশাহারা অভিমান আকাশপ্রমাণ হয়ে উঠল।

এই কবচরেই বীরকন্যা মরে গিয়ে হলো বিষকন্যা।

ঠিক করলাম একবার নিজের চোখে দেখতে হবে মরে যাওয়া বীরকন্যাকে।

ঘেরা উঠোনের মধ্যে টিনের আটচালা। সন্ধে ঘনায়মান। দাওয়ায় বসে অপেক্ষা করছি। গল্প বলছে মরে যাওয়া বীরকন্যার পাতানো ছেলে। খড়গপুরের লাইনে রোজাই লুঠতরাজ আর রাহজানি হচ্ছে, টেলিগ্রামের তার আর ওয়াগন-মাল হাওয়া হয়ে যাচ্ছে—কেমন করে, তার কাহিনি।

দুর্ভিক্ষের আগে এ-অঞ্চলে চোরডাকাতের বালাই ছিল না। পেটে যখন আগুন লাগল, দলে দলে গ্রামের লোক এসে তখন রেলের স্টেশনে ভেঙে পড়ল। মালগাড়ির তলার ফুটো দিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ত ধানচাল, রেললাইনের ওপর থেকে খুঁটে খুঁটে সেই চাল কুড়িয়ে নিত তারা। এত লোকের তো তাতে কুলোয় না। তাই ছড়ানো চালের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য মালগাড়ির ফাঁকের ভেতর লোহার ছুঁচালো শিক গলিয়ে দিয়ে বস্তা ফাঁসানোর ব্যবস্থা হলো। তাতেও চাহিদা মেটে না। শিকের বদলে এবার জোগাড় হলো বড়ো বড়ো লোহার শাবল। যাদের গায়ে কিছুটা জোর আছে, যারা একটু বেপরোয়া গোছের, তারা রাতের অন্ধকারে শাবল চালিয়ে মালগাড়ির দরোজা ফুটো করতে শুরু করল। কিন্তু তাতেও ঝকমারি অনেক। হল্লা হয়, পুলিশ আসে, হাতে হাতকড়া পড়ে! তাই ওদের মধ্যে যারা একটু হুঁশিয়ার গোছের লোক, তারা মাথা খাটিয়ে এমন সব সূক্ষ্ম অস্ত্র তৈরি করতে লাগল যা দিয়ে নিঃশব্দে মালগাড়ির দরোজা একেবারে সটান খুলে ফেলা যায়। তারপর ভেতরে ঢুকে টেনে বার করো বস্তা বস্তা চাল। হলোও তাই।

এদিকে মাঠে মাঠে সোনালি ধান উঠল। যে-সব চাষি না খেতে পেয়ে রেললাইনের ধারে এসে এতদিন দিন কাটাচ্ছিল, তারা ছেলে-বউয়ের হাত ধরে মহা আনন্দে ছুঁটে গেল গাঁয়ে। গেল না শুধু একদল লক্ষ্মীছাড়া হা-ঘরে মানুষ, গাঁয়ে যাদের নিজের বলতে কিছু নেই। স্টেশনের মাটি কামড়ে তারা পড়ে থাকল। এদের নিয়ে তৈরি হলো দুঃসাহসী ডাকাতের দল। পেটের জ্বালায় মালগাড়ি লুট করতে গিয়ে লুটপাটই এদের জীবনের পেশা হয়ে দাঁড়াল।

আজ এখানকার বিরাট অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে এদের মাকড়সার জাল। শুধু মালগাড়ির ধানচাল নয়, পথচালা মানুষের জনপ্রাণ লুটতেও এরা পিছপা নয়। এদের চোরাই মাল গোরুর গাড়িতে করে দোকানে চালান যায় থাম-গ্রামাস্তরে। যাদের সঙ্গে একদিন পথের ধুলোয় পাশাপাশি শুয়ে এরা অনাহারে মৃত্যুর দিন গুনেছিল, তাদের কাছে এখন নির্লজ্জ দামে কাপড় বেচতেও এরা কসুর করে না।

কাছেই রেলের লাইন। একটা ট্রেনের বাঁশি শোনা গেল। তারপর ট্রেনের বাক-বাক-বাক-বাক-বাক-বাক-বাক শব্দের মধ্যে তাল কেটে গিয়ে কয়েকটা ধপ-ধপাস ধপ-ধপাস শব্দ হলো।

লোকটা গল্ল থামিয়ে বলল, শুনলেন তো? চলস্ত গাড়ি থেকে চোরাই মালের বস্তা পড়ছে।

একটু পরে হঠাত দূরে গেটটার কাছে হারিকেনের আলো। আলোয় মুখ দেখা যাচ্ছে না, শুধু লালপাড় একটা শাড়ি দেখা গেল। পেছনে আরও কয়েকটা ছায়ামূর্তি। তাদের মাথায় ভারী মোট। গেটটা খুলে পাতানো ছেলের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে শাড়ি পরা মূর্তি ফুর্তিতে চেঁচিয়ে উঠল—‘ওরে শরৎ বসু খালাস পেয়েছে রে, থানার দারোগাবাবু বলল।’ শুনে বুঝলাম এই নারীমূর্তিই মরে যাওয়া বীরকন্যা।

যে এতক্ষণ গল্ল বলছিল, সে হঠাত আওয়াজ শুনে তড়ক করে লাফিয়ে উঠে গেটের দিকে ছুটে গেল। গিয়ে কী যেন ফিস ফিস করে বলতেই পেছনের ছায়ামূর্তিগুলো তাড়াতাড়ি অন্ধকারের দিকে সরে গেল। একটু পরে মা আর ছেলে লঞ্ছন নিয়ে লম্বা উঠোনটা পেরিয়ে দাওয়ায় এসে উঠল।

দাওয়ায় উঠতেই পুরো মুখটা এবার আলোয় দেখতে পেলাম। এমন বীভৎস কুর মুখ দেখব ভাবতেই পারিনি। এক যুগ আগে এই মুখেই কি জুলে উঠেছিল স্বাধীনতার অগ্রিবর্ণ শপথ?

বানিয়ে বললাম, হয়তো আমাকে মনে নেই। তিরিশ সালের আন্দোলনের কথা মনে আছে আপনার?

মুহূর্তের জন্যে বীভৎস মুখের চেহারা বদলে গিয়ে খুব করুণ দেখাতে লাগল। দুটো জ্বান চোখ স্মৃতির মধ্যে কী যেন খুঁজতে চেষ্টা করল। তিনরঙা একটা নিশান আর তার নীচে হাজার হাজার মানুষের লম্বা একটা মিছিল বুঝি বিলিক দিয়ে গেল অন্ধকারে। মুহূর্তের জন্যে বিষকন্যার মুখে দেখতে পেলাম শুধু একযুগ আগে বীরকন্যাকেই নয়, বিয়ালিশের বুলেট-বেঁধা মাতঙ্গিনী হাজরাকে।

কথা বেশি জমল না। অন্ধকারেই রওনা দিলাম স্টেশনের দিকে। কাঠের গেটটা পেরিয়েই দেখলাম বেড়ার ধারে এক কোণে কতকগুলো বস্তার ওপর বসে অপেক্ষা করছে একদল ছায়ামূর্তি। একটু আগে শোনা দুঃসাহসী দল গড়ার কাহিনি, চলস্ত ট্রেন থেকে ধপাস ধপাস শব্দ, থানার দারোগার গল্ল—মনে মনে সব কিছু মালার মতো গেঁথে নিলাম। বুঝতে একটুও দেরি হলো না—আমি চুকেছিলাম ডাকাতদলের খাস আস্তানায়। অন্ধকারে গায়ে কাঁটা দিয়ে মধ্যমণির মতো জুল জুল করে উঠল একটা বীভৎস মুখ।

—সে মুখ মরে যাওয়া বীরকন্যার।

মেদিনীপুর যে মরে যাচ্ছে। মরে যাচ্ছে শাল-মতুয়ার ছায়া। তান্ত্রিক শাশান আজ, নগর চন্দ্ৰকোণা অরণ্য।

যারা ইংরেজের শিকল পরেছিল সকলের শেষে, সেই চুয়াড় বিদ্রোহীরা কোথায় আজ? কোন শমীবৃক্ষে তোলা আছে তাদের অস্ত্র?

খালের দুধারে নরকঙ্কালের মিছিলে কবে জীবন জেগে উঠবে?



## পাতালপুরীর রাজ্য

আসানসোল থেকে বাসে বাংলার পশ্চিম দুয়ার বরাকরে চলেছি। বাইরে চোখ চাওয়া যায় না। আগন্তের মতো জলছে রাঢ়দেশের রুক্ষ মাটি। যতদুর দৃষ্টি যায়, একটা গাছেরও ছায়া নজরে আসে না। পুব-পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণে বিশাল প্রাস্তর জুড়ে সঙ্গিনের মতো উঁচিয়ে আছে কারখানার চিমনি আর কয়লাখনির চাকাজড়ানো উদ্ধৃত হাঁ-মুখ। দূরে আকাশের কোল ঘেঁষে কল্যাণেশ্বরী পাহাড়। টেউখেলানো মাটি সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে সামনে। মাঝে মাঝে বিরাট গর্ত হয়ে ঝুলে পড়েছে রোদে-পোড়া মাঠের সবুজ। চড়ই-উত্তরাই রাস্তা। রাস্তার ওপর দিয়ে গেছে মালগাড়ির অসংখ্য লাইন। ফুরিয়ে-যাওয়া খনির বাইরের খোলসটা জানিয়ে দেয় এককালে এখানেও খনি ছিল। মরচে পড়া লোহার লম্বা লম্বা খুঁটি আর রং চটা ইটের ভাঙা ভাঙা দেয়াল ফাঁকা মাঠে খসে পড়া মাটির মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। বড়ো রাস্তার দুপাশে সার সার দোকান, কাত হয়ে পড়া মেটে ঘরের মজুর বস্তি। লোক গিজগিজ মাছি ভনভন পচাইয়ের দোকানের সামনে ধুলোর মধ্যে বসে ডালমুট আর পাকৌড়ির ফেরিওয়ালা।

বরাকরে পৌঁছাতে সন্ধে হয়। রেললাইনের ওপারে মানবেড়িয়া থামে আমাদের ইউনিয়ন অফিস। পাশ দিয়ে গেছে সরু সুতোর মতো বরাকর নদী। এপারে বর্ধমান, ওপারে মানভূম। বাংলার শেষ, বিহারের শুরু। ওপারে মাইকার পাহাড় রোদুরে চিকচিক করে।

মানবেড়িয়া থাম কে বলবে? পিচের রাস্তার ওপর ঝুলকালিমাখা কোঠাবাড়ি। জলের কল। ইলেকট্রিক লাইট। রাস্তায় পা পাতা যায় না এত ভিড়। গাঁয়ের মধ্যে যেন শহর উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।

শুনলাম বরাকর বাজারে সেদিন যাত্রাগান হবে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে ছুটে গেলাম মাইলটাক পথ। ও হরি! গিয়ে দেখি যাত্রা নয়, রামলীলা। লেজওয়ালা হনুমান হাত-পা ছুঁড়ে হিন্দুস্থানিতে কী সব আওড়াচ্ছে। তাই দেখতে শহর বেঁচিয়ে লোক এসেছে। অবাক লাগল—এ কেমন বাংলাদেশ! বরাকরের রাস্তায় রাস্তায় ঘূরে দেখলাম বাঙালিয়ানার চিহ্ন নেই। দোকানে দোকানে হিন্দি হরফের সাইনবোর্ড। শহরের সমস্ত লোকই প্রায় অবাঙালি।

কিন্তু বাংলার আর কোথাও এমন অপরূপ রাত্রি খুঁজে পাবে না। যেদিকে তাকাও মাঠের পর মাঠ জুড়ে আলোয় আলো রাত্রি। মনে হয়, আকাশের তারাগুলো উড়ে এসে বসেছে মাঠে মাঠে। দূরে আসানসোল স্টেশনের সার্চলাইট দেখা যায়—বারবার আকাশ প্রদক্ষিণ করে কী যেন তন্ন তন্ন করে খুঁজছে।

রাস্তিরে শুতে গিয়ে অবাক। ঠুং-ঠাং ঠুং-ঠাং শব্দ কীসের? মেঝে থেকে মাথা তুলতেই আর শব্দ নেই। খিল খুলে বাইরে এলাম। রাস্তা নিশুভ্র। সামনের মাঠ পেরিয়ে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে বালতোড়িয়া কোলিয়ারি।

মাটির নীচে সুড়ঙ্গ গেছে। দিন নেই, রাত নেই—আলোবাতাসহীন সেই সুড়ঙ্গ থেকে কয়লা তোলে খনির মজুররা। ঠুং-ঠাং শব্দ কি সেই পাতালপুরীর?

পরদিন সকালে একেবারে অন্য রকম মনে হয় বরাকরকে।

মাঠটা বিষ্টায় ভরে আছে। দুর্গন্ধে টেকা যায় না। কোলিয়ারির ঠিক পাশ দিয়ে গেছে মালগাড়ির লাইন। সামনেই কলের চালুনিতে কয়লা বাড়াই হচ্ছে। লোডিং কামিনরা সেই কয়লা ছোটো ছোটো টুকরিতে করে মালগাড়িতে বোঝাই করছে। মেঝে মজুরদের বলে কামিন; কয়লা যারা বোঝাই করে তাদের বলে লোডিং কামিন। গা দিয়ে তাদের ঘাম গড়াচ্ছে; কয়লার গুঁড়ো লেগে চোখগুলো লাল টকটকে হয়ে আছে। সারাদিন খেটেও এরা মাস গেলে পনেরো টাকাও মজুরি পায় না।

রেললাইনের এপারে-ওপারে দুটো কুলি বস্তি। উপর-ধাওড়া আর নীচু-ধাওড়া। বস্তিকে ওরা বলে ধাওড়া। এই ধাওড়াগুলো কী চিজ বাইরে থেকে একদম বোঝা যায় না।

উপর-ধাওড়ায় উঠতেই একটা জলের কল। কলের সামনে পর পর উপুড় করা প্রায় পাঁচশো কলশি। দোকানে কাপড় কিনতে লোকে যেমন কিউ করে দাঁড়ায়, ঠিক তেমনি মানুষের বদলে কলশিগুলো দাঁড়িয়ে আছে দু-ফেঁটা জলের জন্যে। উপর-ধাওড়ায় লোক থাকে হাজারখানেকের কিছু বেশি। তাদের জন্যে দুটো মাত্র জলের কল। তাও চবিশ ঘন্টার মধ্যে কলের জল থাকে মাত্র সাড়ে তিন ঘন্টা। একফেঁটা জলের জন্যে অনেক সময় রক্তারক্তি পর্যন্ত হয়ে যায়।

বাতিঘরের কাছে এসে দেখলাম রাতের পালি শেষ করে দলে দলে মজুর আর কামিনরা খাদ থেকে ওপরে উঠছে। সর্বাঙ্গে তাদের কয়লার গুঁড়ো যেন কেটে বসেছে। মাটির নীচের জুলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে তারা উঠে আসছে। উঠেও শাস্তি নেই। একফেঁটা জলের জন্য ছটফট করতে হবে সারাটা দিন।

মুদিখানার রোয়াকে দেখলাম বিশ-বাইশ বছরের একটি মেঝে মড়ার মতো পড়ে আছে। মাটির নীচে আট ঘণ্টা এক নাগাড়ে খেটে কিছুক্ষণ হল সে ওপরে উঠেছে। ছোটো ভাইটা জল ধরে রাখতে পারেনি; তাই ছায়ায় শুয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। আজ আর তার স্নান হবে না। কয়লামাখা শরীর নিয়েই সন্ধেবেলায় আবার খাদে নামতে হবে।

ধাওড়াগুলোর মাঝখান দিয়ে গেছে ছোটো অপ্রশস্ত গলি। দুপাশে স্তূপাকার জঙ্গল। নর্দমার বালাই নেই। গলির মধ্যে চুকলে পোচাপের তীব্র ঝাঁঝো দম বৰ্ষ হয়ে আসে। এখানে একদিন থাকলে নরকবাসের ভোগাস্তি কী হাড়ে হাড়ে বোৰা যায়।

ঘর তো নয়, অন্ধকৃপের মতো ছোটো ছোটো পায়রার খোপ। একটা মাত্র দরোজা। জানলার বদলে তাদের ঠিক নীচে দুটো ঘুলঘুলি। ছোটোবেলায় এক মফস্সল শহরে মেঠেরপাড়ায় এক শুয়োরের খোঁয়াড় দেখেছিলাম। চারিদিক বৰ্ষ। তাতে শুধু একটা ছোটো জানলা—সেই জানলা দিয়ে লোহার ফলা গলিয়ে শুয়োর মারা হতো। আর অসহ্য যন্ত্রণায় শুয়োরগুলো ছটফট করত। ধাওড়াগুলো দেখে কেবলি আমার সেই শুয়োরের খোঁয়াড়গুলির কথা মনে হচ্ছিল। একেকটা ঘরে শুধু একটা নয়, দুটো-তিনটে পরিবার তাদের পঞ্চপাল নিয়ে থাকে। আর তাদের পাশে শুয়ে থাকে ছাগল, শুয়োর, হাঁস, মুরগি সবকিছু।

দরোজার বাইরে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কাঁচা কয়লার উনুন সর্বদা জুলছে। ঠিক পাশেই ছোটো ছোটো উলঙ্গ শিশুরা ধুলোর মধ্যে হামাগুড়ি দিচ্ছে। তাদের দেখবার কেউ নেই—বাপ-মা দুজনেই গেছে কাজে। ঘরের মধ্যে তাদের সম্পত্তির মধ্যে আছে শুধু দুটো-চারটে মাটির হাঁড়ি। গরম ভাতের সঙ্গে একটু হলুদগোলা নিরামিয় বোল—এই হচ্ছে ওদের খাওয়া। আর এই খেয়ে ওরা দিন নেই রাত নেই ভূতের মতো খাটে।

না খেটে যে উপায় নেই। দু-তিন পুরুষ আগে যজ্ঞেশ্বর তুরীদের এখানে ঘরবাড়ি ছিল, জমিজমা ছিল। সব খুইয়ে এখন তারা বাপবেটায় এসে খনিতে কাজ নিয়েছে।

জামুরিয়া থানার পরিহারপুর গ্রাম কীভাবে উঠে যাচ্ছে, তা আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। উঠে যাবার নোটিশ এসেছে পরিহারপুরের বাসিন্দাদের ওপর। তারা উঠি উঠি করে উঠতে পারছে না। অনেকদিনের স্মৃতি জড়ানো গাছ, ডেবা। জায়গাজমির মায়া কাটাতে কষ্ট হয়। দু-দিন পরে যজ্ঞেশ্বর তুরীর মতনই তাদের অবস্থা হবে। খনির মালিকের কাছ থেকে তারা নামমাত্র ক্ষতিপূরণের টাকা পাবে। তারপর পেটের জ্বালায় খনিতেই কাজ নিতে হবে।

খনির নিজস্ব হাসপাতাল আছে। এই হাসপাতালকে মজুররা যমের মতো ভয় করে। যার মৃত্যুভয় নেই, সেই শুধু এই হাসপাতালে আসে। আর কেউ হাসপাতালের ছায়া মাড়ায় না। হাত-পা কেটেকুটে গেলে মজুররা অনেক সময় হাসপাতালে আসে। দুর্ঘটনায় কারো অঙ্গহানি হলে মালিক তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে আইনত বাধ্য। কিন্তু সে আইন বড়োলোকের জন্যে—গরিব লোকের জন্যে নয়।

ট্যাঙ্গেল কুলির কাজ করত কেষ্ট তেলি। বাতিঘরে লোহার ফটক পড়ে বছরখানেক আগে বেচারার ঘাড়টা চিরকালের মতো বেঁকে গেল। একটা চোখও কানা হলো। কিন্তু মামলা করেও আজ পর্যন্ত সে কোম্পানির কাছ থেকে তার পাওনা এক পয়সাও আদায় করতে পারেনি।

মাথার ওপর সময় সময় কয়লার চাপ ধসে, হঠাৎ হঠাৎ গ্যাস হয়ে হামেশাই খাদের নীচে মানুষ মারা যায়। খাদের নীচে যারা কাজ করে প্রাণ হাতে করে কাজ করতে হয়। এছাড়াও যা সব খুনজখম হয়, তা শুনলে গায়ে কাঁটা দেবে। কয়লাখনির ঠিকেদার, ম্যানেজার সবাই প্রায় সাহেবসুবেরাই হয়ে থাকে। তাদের দয়ামায়া বলে কিছু নেই। জানোয়ারের চেয়েও বেশি হিংস্র এরা। এদের বদখেয়ালের বিরুদ্ধে যে দাঁড়াবে, তার নিষ্কৃতি নেই। এদের হাতে একদল গুঁড়ার সর্দার থাকে। মনিবের একটু ইশারা পেলেই তারা যে-কোনো কুলিকামিনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে। পাতালপুরির রাজ্য তাদের তাই অসীম দাপট। যারা খুন হয় তাদের লাশও নাকি খুঁজে পাওয়া যায় না।

বছর দুই আগে বালতোড়িয়া খাদে এমনি এক মুনশির লাথিতে মরেছিল হলেজ খালাসি ত্রিভঙ্গ রায়। ত্রিভঙ্গের লাশ লুকিয়ে ফেলতে পারেনি। ত্রিভঙ্গই ছিল সৎসারের একমাত্র রোজগেরে মানুষ। কোম্পানির নামে ত্রিভঙ্গের বউ খেসারত চেয়ে নালিশ রুজু করেছিল। ত্রিভঙ্গের জীবনের দাম সাব্যস্ত হয়েছিল আটশো টাকা। কিন্তু এক বছরে ওর মামলা চালাতেই নাকি আটশো টাকার ওপর খরচ পড়ে গিয়েছিল। ত্রিভঙ্গের বাড়ির কেউ বেঁচে থেকে সে টাকা নিতে পেরেছিল কিনা জানি না।

খনির ভেতরের খবর বাইরের বিশেষ কেউ জানে না। কর্তৃপক্ষের বিশ্বস্ত ও চেনাশুনো লোক ছাড়া বাইরের কেউ খনির নীচে নামতেও পারে না। কাজেই লুকিয়ে খাদের নীচে নামার ব্যবস্থা করতে হলো। একজন মুসলমান সর্দারের সঙ্গে কথা হলো। সে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। বলতে হবে ‘দেশকা আদমি’। চশমা খুলে রেখে যেতে হবে, শার্টের বদলে গেঞ্জি আর ধূতির বদলে লুঙ্গি পরতে হবে। রাস্তির তিনটের সময় দাঁড়াতে হবে বাতিঘরের সামনে। মালিকের লোক চিনে ফেললে বিপদ হতে পারে।

লিফটের মতো বিরাট কপিকলটা বাইরের আলো ছেড়ে বিদ্যুৎবেগে যখন নীচে নামে, তখন হঠাৎ অন্ধকারে দম বন্ধ হয়ে আসে। চোখে জমাট অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখা যায় না। নামতে নামতে মনে হয় যেন কোথায় কোন পাতালে তলিয়ে যাচ্ছি। পৃথিবীর জল-বায়ু-মাটির জন্যে মনপ্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। হঠাৎ পায়ের নীচে কপিকলটা ঘটাএ করে আটকায়। হাতে আপাদমস্তক ঢাকা সেফটি ল্যাম্প আর কাঁধে গাঁইতি নিয়ে সবাই নেমে দাঁড়ায়।

খাদের গা দিয়ে জল চুইয়ে পড়ছে। গোলকধার্মার মতো অসংখ্য সুড়ঙ্গ চলে গেছে ডাইনে বাঁয়ে। মোড়ে মোড়ে হাওয়া চলাচলের খোলা দরোজা। একটু দূরে দূরে ইলেকট্রিক আলো।

কয়লা কাটার নানা রকমের ব্যবস্থা। কেউ ড্রিল-মেশিনে কয়লা কাটছে, কেউ ডিনামাইট দিয়ে ধসিয়ে দিচ্ছে কয়লার বড়ো বড়ো চাংড়া, কেউ গাঁইতি দিয়ে কয়লা চুটাচ্ছে। যারা বাবুদের আওয়াজ করে কয়লা ‘গিরিয়ে’ দেয়, তাদের বলে শর্ট-ফায়ারার। খাদমজুরদের বলে, মালকাটা। এখানে এক রকমের কিন্তু ভাষা গড়ে উঠেছে। না বাংলা, না হিন্দি, একরকমের পাঁচ মিশেলি ভাষা। এখানকার বাঙালি কুলিকামিনরাও সেই ভাষাতেই কথা বলে। খাদের নীচে টবে কয়লা ভরতির পর সেই টব দড়ির কলে ওপরে তোলে হলেজ খালাসিরা। টব টেনে তোলার জন্যে আলাদা আলাদা লাইনপাতা সুড়ঙ্গ। সেই লাইন ঠিক রাখার জন্যে আছে সাফাই কুলি। ভরতি টব ঠেলে নিয়ে যাওয়া আর খালি টব মালকাটাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ টালোয়ানদের। ওপরের কয়লার চাপ ভেঙে পড়ার মতো হলে কাঠের ঠেকো দেয় যারা, তাদের বলে কাঠমিস্তি। এছাড়া রাজমিস্তিও আছে; তাদের কাজ ইটের গাঁথুনি দেওয়া। খাদের নীচে চোঁয়ানো জল মারার জন্যে আছে পাম্প খালাসি আর বেলিং খালাসি। বেলিং খালাসিরা হাতে করে ঝুড়ি আর বালতি দিয়ে জল মারে।

এদের সকলের ওপর খবরদারি করে পিট-সরকার, ইনচার্জ আর ওভারম্যান। এদের দস্তুরমতো ঘুষ না দিলে কয়লাখাদে কারো বাঁচার ক্ষমতা নেই। পাতালপুরীর কোটাল এরা।

পদে পদে দুর্ঘটনা বাঁচিয়ে খাদমজুরদের কাজ করতে হয়। এক মুহূর্ত অস্তর্ক হলে বিপদ অনিবার্য। এক একজন মজুর এক পালিতে খেটে যা রোজগার করে তাতে পোষাতে পারে না। তাই দু-পালিতে একসঙ্গে আঠারো ঘণ্টা বিশ ঘণ্টা খাটতে হয় অনেককে। খাদে যারা কাজ করে, বেশিদিন তারা বাঁচে না। হুকওয়ার্ম, যক্ষা, কুষ্ঠ আর নিউমোনিয়া খনি অঞ্চলে সঙ্গের সাথি।

খাদের নীচে একটানা সুড়ঙ্গ চলে গেছে। সুড়ঙ্গকে বলে সুন্দ। সুন্দের মধ্যে মাথা নীচু করে হাঁটতে হয়। না হলে যে-কোনো সময়ে শক্ত পাথরে মাথা ঠুকে যাবার সন্তাবনা।

অভ্যেস না থাকলে বেশিক্ষণ থাকা যায় না। কয়লার গাঁড়োয়া দম আটকে আসে।

যখন ওপরে এলাম, সকাল হতে বেশি দেরি নেই। মনে হলো দু-ঘণ্টার জন্যে যেন নরকবাস করে এলাম।

সামনে কয়লাখাদে কুলিদের ধাওড়াগুলো নজরে পড়ল। সকালের পালিতে যারা কাজে যাবে, তারা জেগে উঠেছে। পেটে খিদে নিয়ে এক নরককুণ্ড থেকে আর এক নরককুণ্ডে চলেছে তারা।

তার একপাশে সাহেব ঠিকেদারের আর ম্যানেজারের বাংলো। সামনে লাল-লাল ফুলের বাগান। মনে হল হাজার হাজার মজুরের বুকের রক্ত ওদের বাগানে ফুল হয়ে ফুটে আছে।

খনির মজুররা এতদিন বুঁজে সব সহ্য করে এসেছে। ওপরের দিকে অসহায়ভাবে হাত তুলে নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়েছে। আজ আর সেদিন নেই। খনির অন্ধকারেও আলোর খবর পৌঁছেচ্ছে। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দল তৈরি হয়েছে খনিমজুরের। সাঁওতাল বিদ্রোহীদের রক্ত আজও শিরায় শিরায় বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে যারা, আস্তে আস্তে তারা অন্ধকারে উঠে দাঁড়াচ্ছে। বীরসা মুন্দার বংশধরেরা ভগীরথের মতো মাটির নীচে বয়ে নিয়ে যাবে রক্তগঙ্গাকে। পিতৃপুরুষের ক্ষুধিত আত্মাকে তৃপ্ত করবে তারা। তাদেরই দিকে তাকিয়ে খনিমালিক সাহেবদের বাগানের লাল ফুল লাল আগুন হয়ে জুলে উঠবে। দেরি নেই।





## কলের কলকাতা

... কলের কলকাতা রে ভাই, কলের কলকাতা। হেই চলে হাওয়াগাড়ি হুস হুস। ট্রাম চলে ঠন ঠন। রাস্তায় এই লোক তো এই লোক। বাস রে, সে কী আজব শহর। কী দেখলাম কওয়া যায় না। কত যে বাড়ি, কত যে গাড়ি, বাস রে! কোথাও মাটি নাই, কোথাও সাঁকো নাই—শুধুচুন-বালি-ইট আর শুধু পাথর। কলের কলকাতা রে ভাই, কলের কলকাতা। কল খুললে জল, কল টিপলে আঁধারে ভাই জ্যোছনা ফিনিক দেয়। রাত রাত নয়, দিন দিন নয়। বাস রে, সে কী আজব শহর! কী দেখলাম কওয়া যায় না। কত যে গলি, কত যে মোড়, বাস রে—যতই ঘূরি মাথা বনবন, পা কনকন করে। হঠাৎ দেখি আমার ছায়া। তার পাশে ষণ্মার্কা লম্বা চওড়া আরও একটা ছায়া। পেছনে কে রে? দেখে তো আমি ভিরমি যাই। ইয়া ইয়া গৌঁফ, ইয়া ইয়া দাঢ়ি। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। হাতে লম্বা লাঠি। বুকে ঝুলছে পাঞ্জাবির ওপর হাতকাটা রংচঙ্গে একটা ফতুয়া। কাঁধে বোলানো একটা বুলি। ছোটো ছেলে দেখেছে কি কপার। ঠকঠক করে কাঁপি আর ইষ্টনাম জপি। হঠাৎ লোকটা এগিয়ে যায়। নিশ্চয়ই দেখতে পায়নি। নইলে এতক্ষণে কোন মুল্লুকে হাওয়া। বসে বসে হিং খাচ্ছি, হিং-টিং-ছট শুনছি। বাস রে, সে কী আজব শহর! কী যে দেখলাম কওয়া যায় না। দু-পাশারি দোকান দু-পাশারি হাট—গাড়ি চাইলে গাড়ি, বাড়ি চাইলে বাড়ি। যা চাইবে তাই পাবে। বাস রে, কী আজব শহর!....

—পঁচিশ বছর আগে কালীঘাট থেকে পৈতে নিয়ে দেশে ফিরে এসে কলকাতার গল্প বলেছিল মোনা ঠাকুর। তাও কি বলতে চায়? যুদ্ধের সময় পুঁচকে আলপিনের ও যেমন দাম বেড়ে যায়, কলকাতা থেকে ফিরে তেমনি দাম বেড়ে গেল মোনা ঠাকুরের। মাটিতে যেন পা পড়তে চায় না। নইলে রোগাপটকা ছেলেটাকে কে পুঁচত? টোকা মারলে যে চিতপটাং হয়ে উলটে পড়ে, পেয়ারা গাছে উঠতে হাঁটু কাঁপে—পৈতে নেবার পর তার কান-বেঁধানো

ন্যাড়া মাথাটায় তেরে-কেটে-তাক বলে তবলা না বাজিয়ে শেষ পর্যন্ত কিনা মধুকুলকুলির মগডাল থেকে চুরি করে পাড়া আস্ত দুটো আম ঘূর দিয়ে তার কাছ থেকে গল্প শুনতে হলো! তাও একদিনে নয়। টিপে টিপে সে তার পুঁজি ভাঙল। গরজ বড়ো বালাই। তাই রয়ে সয়েই শুনতে হলো। কলকাতার গল্প না শুনে পেট আমাদের ফুলে উঠেছিল না।

কিন্তু এমন যে আজব শহর কলকাতা যেখানে কল খুললে জল, কল টিপলে জ্যোচ্ছনা ফিনিক দেয়—দু-দিন যেতে না যেতেই সে শহর ছেড়ে এ পোড়া দেশে ফিরে আসতে হলো কেন? সে গল্পও বলেছিল মোনা ঠাকুর।

...কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ খুন চাপে শহরটার মাথায়। মাথা খারাপ শহরটার। ফট ফট বন্ধ হয় দরজা আর জানলা। বড়ো বড়ো দালান যেন হানাবাড়ি। বুরো যায় না মানুষজন আছে কি না আছে। রাস্তা ফাঁকা। রাত অঁধার। কানে তালা লাগে হল্লায়: হা রে রে রে রে! মুসলমানগুলাকে কাটব। হা রে রে রে রে রে! হিন্দুগুলাকে কাটব। ছুরি বার হয়, লাঠি বার হয়। লেগে যায় নারদ-নারদ। সে কী রক্ত, সে কী আগুন বাস রে। লাশ গড়ায় রাস্তায়। ভয়ড়ের নাই কিন্তু সাহেবদের। তারা মিটি মিটি চায় আর ফিকফিক হাসে। হিন্দুও ছুঁবে না তাদের, মুসলমানও ছুঁবে না। রাজার জাত তো। গায়ে হাত দেয় সাহস কার? এই না দেখে ধর্মশালার যাত্রী সব ভয়ে কাঠ। বলে প্রাণ নিয়ে পালাই। হাঁ-হাঁ করে আসে পাঞ্চারা। যাত্রীদের টাঁকের দিকে তাকায় আর বলে: আহা-হা, ভয় কীসের? আমরা আছি, ভয় কীসের? শোনে না কেউ। খ্যাপা শহর। কিছু মাথার যদি ঠিক থাকে। এই ঠান্ডা তো এই গরম। বাস রে! কখন কী হয় কি বলা যায়? ছ্যাকরা গাড়িতে না উঠে, দরজা-জানলায় খড়খড়ি ফেলে সেই রান্তিরে সব দে ছুট।...

বছর পাঁচেক পর নিজের চোখে দেখলাম সেই আজব শহরকে। মোনা ঠাকুরের সেই কলের কলকাতা।

ইস্টশান থেকে কোথা দিয়ে কেমন করে এলাম কিছু মনে নেই। যেন এক আলো জলা সুড়ঙ্গের মধ্যে চুকলাম—এইটুকু মনে আছে। চারদিকে প্যাকিং বাস্তুর মতো গাদা গাদা বাড়ি। একটার সঙ্গে একটা যেন আঠা দিয়ে সাঁটা।

পরদিন কলের জল আর বাসন মাজার শব্দে ঘূর ভেঙে গেল। পরিব্রাহ্ম কাক ডাকছে কা-কা-কা। রোদুর দেখা না গেলেও সকাল না হয়ে যায় না। দরজার খিল খুলে বাইরে দাঁড়াতেই অবাক। সামনে কানাগলির মোড়ে দোতলা-সমান উঁচু টেলিফোনের তার ঠিক যেন মুক্তের মালার মতো দেখাচ্ছে। ফোঁটা ফোঁটা শিশিরের অগুনতি আয়নায় মুখ দেখছেন সাত রঙের সাত ঘোড়ায় চাপা সূর্যদেব।

কিন্তু যত যাই বলো সে খোলা মাঠ আর নীল চোখের মণির মতো আকাশের কাছে প্যাকিং বাস্ত-মার্কা এই শহর কিছু না। গলির মোড়ে ফুটো পয়সার মতো এই আকাশ। তাও দাঁড়িয়ে দেখার যো নেই। পেছন থেকে ভিড় এসে ঠেলে নিয়ে যাবে। কী বিছিরি শহর, বাবা। এমন শহরে থাকতে আছে! গোমড়ামুখো লোকগুলো সব ঘাড় হেঁট করে ঘুরে বেড়ায়! একবার কেউ ডেকে জিজেসও করে না—কেমন আছো হে! মনে মনে চটে যাই মোনা ঠাকুরের ওপর। একটা আস্ত দামড়া গাধা। এর চেয়ে ভালো ছিল আমার ডুগডুগির হাট, দুধপাতলার মাঠ। তের ভালো ছিল আমার ইচ্ছামতী নদী। উঁচু পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে বুক টান করে বাঁপ দাও, ডুব দিয়ে শামুক তোলো। চনচনে ক্ষিধে। তার কাছে সরু সুতোর মতো কলের জল—ছোঃ।

দম-দেওয়া কলের পুতুলের মতো যে-মানুষগুলো সকাল বেলায় রাস্তা দিয়ে হনহনিয়ে হেঁটে গেল, বিকেলে দেখি তাদের দম গেছে ফুরিয়ে। কালিকুলি মেখে আস্তে আস্তে পা ফেলে টলতে টলতে ফেরে। গাঁয়ে এমন সময় নীলকুঠির মাঠ থেকে গোরুর পাল পায়ে ধুলো উড়িয়ে ফিরত। আর পশ্চিম দিকের আকাশটায় এইসময় কারা যেন সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিত।

আর ঠিক সেই সময় শানবাঁধানো রাস্তায় কলের কলকাতাকে বিষম ঠাট্টা করে পিচচালা রাস্তায় মেরেলি গলায় কে যেন চেঁচিয়ে উঠল—মাটি লেবে গো মাটি।

মনে মনে আমি ভারি খুশি হই। কেমন জব ? কেমন ?

আর আদিগন্ত মাঠ নয়, মাটির শুধু একটা ডেলার জন্যে আমার মনটা কেমন করে উঠল।

এমন যে নীরস শানবাঁধানো কলকাতা, তাকে কেমন করে একদিন ভালোবেসে ফেললাম—সে কথা আমার নিজেরই জানা নেই।

কানাগলির মোড়ে বাঁদিকের বাড়ির গায়ে ঝোলানো গ্যাসের ঢিমতিমে আলো। তার নীচে মিষ্টির দোকান। ডান হাতে কর্পোরেশনের ইস্কুল। তার সামনে বড়ো একটা রোয়াকে বুড়োদের আড়ডা। একটু এগিয়ে এক পা-কাটা দজির দোকান। ছেলে-ছোকরাদের আড়ডা সেখানে। পাড়ায় নানা রকমের লোকের বাস। কেউ ডাক্তার, কেউ কবিরাজ; কারো লোহালকড়ের, কারো সোনারুপোর দোকান; কেউ সওদাগরি অফিসে চাকরি করে, কেউ বাড়িভাড়ার টাকায় বসে খায়। ডাক্তারবাবুর সেঙ্গে ভাই রেলের ক্যানভাসার, কবিরাজ মশাইয়ের ছোটো ছেলে বিলেতফেরত। আডিদের বাড়ির এক ছেলে টাকা জাল করে জেল খাটছে।

বিকেল হলে পাড়ার সব ছেলে ছাদে যায়। পাড়া কাঁপিয়ে শুধু একটা আওয়াজ ওঠে—ভোঁ-কাটা। একা আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই।

বউবাজারের মোড় থেকে এসপ্ল্যানেড অব্দি সেন্টাল অ্যাভিনিউয়ের দু-পাশে ফাঁকা জমি। মলঙ্গা লেনের কাছটাতে চিনেদের থিয়েটার। এদিক ওদিক দু-একটা পাঁউরুটি তৈরির কারখানা। এক জায়গায় রিস্কার ওপর বসে এক সম্যাসিনী বুড়ি। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত বুপোর গয়না দিয়ে মোড়া। ওড়িয়া ভাষায় বিড় বিড় করে কী সব বকে চলেছে। লোকে গদগদ হয়ে শুনছে আর পায়ের কাছে পয়সা ফেলছে।

খালি মাঠে সবসময় ভিড়। ডুগ-ডুগ-ডুগ-ডুগ ঢোলক বাজছে। ম্যাজিক দেখাচ্ছে কেউ। কাঁধ পর্যন্ত বাবরি চুল। কানে লোহার মাকড়ি। অনবরত মন্ত্রের আওড়াচ্ছে আর মাঝে মাঝে চ্যাচচ্ছে— লেড়কালোক একদফে হাততালি লাগাও। বকতে বকতে মুখ দিয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে। শুকনো মুখ। দেখলেই মনে হয় সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। বাজি দেখানো শেষ হতে না হতে ভিড় পাতলা হতে থাকে। পাছে পয়সা দিতে হয় তাই যে যার মতো কেটে পড়ে। মাটিতে ছড়ানো দু-চার আনা পয়সা কুড়িয়ে নিতে নিতে শাপমুনি দিতে থাকে ভানুমতীর জাদুকর। ফুস-মন্ত্রে পয়সাকে টাকা করতে পারে না তবে কীসের বাজিকর? পালাতে পালাতে মনে হয় শাপমুনিগুলো বুঝি আমার পেছনেই তাড়া করছে।

পাশে আর একটা ভিড়। দাঢ়িওয়ালা একজন হেকিম। পরনে তার লাল আলখাল্লা। গলায় হাড়ের মালা। চোখে নিকেলের ফ্রেমের মোটা চশমা। একটা দিক সুতো দিয়ে বাঁধা। সামনে তার একরাশ গাছ-গাছড়া, কাঁচা-ছালচামড়া, হাড়, কাচের কৌটোয় জোঁক আর বিছে, নীল গাইয়ের চামর। বিছিরি নোংরা। দুর্গন্ধে অল্পপাশনের ভাত উঠে আসে। কত সব ভারী ভারী রোগের নাম করছে। বাতলে দিচ্ছে কোন রোগের কোন দাওয়াই।

কানের খোল পরিষ্কার করতে বসেছে কেউ। কোথাও ভাঙা কাচ জোড়া লাগাবার আশ্চর্য কাঞ্চকারখানা দেখতে ভেঙে পড়েছে লোক। কোথাও চড়াই পাখি মানুষের ভাগ্য গণনা করছে। বিচিত্র ব্যাপার চলেছে লম্বা রাস্তাটা জুড়ে।

শীতকালে খালি মাঠগুলো জুড়ে তাঁবু পড়ে। সার্কাস আর কানিংভালের। লাল-নীল আলোয় ঝলমল করে ওঠে গোটা তল্লাট। চাকা-লাগানো মেটা মোটা লোহার গরাদ-আঁটা খাঁচার মধ্যে খিদের সময় গজরাতে থাকে বাঘ আর সিংহ। মানুষের গম্বে জিভ দিয়ে তাদের লালা গড়ায়। সার্কাসের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলো থাকে জেলখানার করেদির মতো। রোজ সকালে উঠে কসরতগুলো অভেস করতে হয়। একটু ভুল হলে সপাং সপাং চাবুক। তাই মুখে সবসময় একটা মন-মরা ভাব। টিনের বেড়ার ফুটো দিয়ে তারা বাইরে তাকায় আর মার জন্যে ভাইবোনদের জন্যে মন কেমন করে।

হঠাতে একটা ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন পকেটে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—আমার মানিব্যাগ? যেই বলা অমনি ‘ধর ধর’ করে ছুটে গেল জনকয়েক লোক একজনের পেছনে। ছুটেছুটি হই-হল্লা। মাঠ ফাঁকা হয়ে গেল। ভদ্রলোক যেমন দাঁড়িয়েছিলেন, তেমনি দাঁড়িয়েই থাকলেন। চোরকেও পাওয়া গেল না, চোর যারা ধরতে গেল তাদেরও আর টিকি দেখা গেল না।

তবু ভালো এই সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের রাস্তা। আকাশ এখানে অনেক দরাজ। এ-রাস্তার মানুষগুলোও যেন একটু আলাদা। ঢেলক বাজায়, হাততালি দেয়, হো-হো করে হাসে। উড়ে-মেড়ে-বাঙাল বলে কোনো কথা এ-রাস্তার অভিধানে নেই।

সরু একটা গলির মধ্যে এঁদো ঘরে থাকে ফুচকা, পাকৌড়ি আর আলু-কাবলিওয়ালার দল। কাবলিওয়ালারা থাকে নেবুতলার মোড়ে। কাছ দিয়ে গেলে ভয়-ভয় করে। শুনি নাকি ছেলেধরাদের আস্তানা ওটা। ঝুলি দেখা যায় না, তবে থাকতেও তো পারে।

রাস্তার কলে ভিস্তিওয়ালার ভিড়। ড্রেনের জলে গা ধোয় একদল। হেঁহেও হো, হেঁহেও হো! সুর টেনে টেনে রাস্তার সুরকির ওপর দুরমুশ চালায় কর্পোরেশনের কুলি।

ঘামের গম্বে, বনবন শব্দে জমজমাট শহর কলকাতা। চুন-বালি-ইটেরও একটা সৌন্দর্য আছে। সন্ধেবেলা বড়ো রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি ট্রামের তারে চকমকির আগুন জ্বলে। পেতলের পিদিম জ্বালিয়ে ঘোরে মুশকিল আসান।

হঠাতে একদিন খেপে উঠল কলের কলকাতা। গলিগুলো সব এক টানে বড়ো রাস্তায় এসে পড়ল। শহরময় চাঞ্চল্য। হই-হল্লা। গোলপুকুরে মিটিং। গোলদিঘিতে মিটিং। রাস্তার মোড়ে মোড়ে মিটিং। মিটিং ছাড়া মানুষ নেই। পাড়ার ছেলেরা বাঙাল বলে আর খেপায় না। কাঁধে হাত দিয়ে বলে, চল ভাই মিটিং।

পার্কে রোজ মিটিং আর ইঙ্গুলে পিকেটিং। এ এক নতুন মজা। কেন কেউ জানে না। কিন্তু মেতে উঠেছে সবাই। কেউ আর ছাদে নয়, সব রাস্তায়। জনসমুদ্রে জোয়ার লেগেছে।

একটু একটু করে বোবা গেল। স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়? ইংরেজ চলে যাক, আমাদের দেশ আমাদের থাক। সত্যিই তো, কেন আমরা পরাধীন থাকব?

সারা শহরে আগুন। সে-আগুনে জ্বলছে বিলিতি কাপড়। পাড়ায় পাড়ায় দল বেরিয়েছে। গমগম করছে তাদের আওয়াজ—বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে ফেলো। দুপাশের বাড়ি থেকে রাস্তায় ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে রাশি রাশি বিলিতি কাপড়।

রোয়াকের ওপর বসে বুড়োর দল তকলি ঘোরাচ্ছে। সুতো কাটার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে গল্পগুজব। সারাদিন কোথায় কী ঘটেছে সম্মেবেলায় তার হিসেবনিকেশে দেন ডাঙ্গারবাবুর ক্যানভাসার ভাই। আজ অমুক পার্কে লাঠি চালিয়েছে—উঃ কী রস্ত! কাল ময়দানে ঠিক গুলি চালাবে। ভয়ে আঁতকে উঠে যে যার ঘর আগলাবার জন্যে বুড়োর দল তকলি হাতে করে বাড়িমুখো ছোটে।

সারাটা দিন নেশার মতো লাগে। জলখাবারের পয়সা থেকে বাঁচানো চার আনা পয়সা দিয়ে শেয়ালদার মোড় থেকে কিনে আনি খদরের টুপি। সেই টুপি মাথায় দিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরি। দু-ধারের বাড়িগুলো থেকে লোকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। ছোট ছেলে কিন্তু বুকের পাটা দেখো! পুলিশকে মোটে কেয়ার করে না হে!—বুরতে পেরে বুক যেন আরও দশ হাত হয়।

বিকেলে বড়বাজার স্ট্রিটে কংগ্রেস আপিসের সামনে এসে দাঁড়াই। বাড়িটাতে ঢোকবার মুখে রুটিবিস্কুটের দোকান। তার একপাশে তেলেভাজা ফুলুরি বিক্রি হয়। পাশ দিয়ে গেছে চোরাগলি। দুই ফুটপাথে দুরস্ত ভিড়।

পাশের বাড়ি থেকে হঠাত শাঁখ বেজে উঠল। কংগ্রেস আপিসে সাজো-সাজো রব পড়ে গেল। দোতলায় রেলিঙের গায়ে উড়ল প্রকাণ্ড তিনরঙা পতাকা। ততক্ষণে লাল পাগড়িতে ছেয়ে গেছে চোরাগলি। তেল-চকচকে লাঠিগুলো উঁচিয়ে ধরে বীরদর্পে ঢুকে গেল তারা কংগ্রেস আপিসে। সঙ্গে সঙ্গে ‘বন্দেমাতরম’ আওয়াজে কেঁপে উঠল গোটা তল্লাট। গেটের কাছে এসে দাঁড়াল কালো ঢাউস কয়েদি গাড়ি। গোরা সার্জেন্টগুলো বেতের ছাড়ি চালিয়ে ভিড় সরাতে লাগল। দোতলায় লাইন বেঁধে দাঁড়াল গাঞ্চিটুপি মাথায় দেওয়া ভলান্টিয়ারের দল। তাদের মাঝখানে ফুলের মালা গলায় দিয়ে ‘ডিরেক্টর’।

ভিড় ঠেলতে ঠেলতে ভরতি ভ্যান চলল মুচিপাড়া থানায়। পেছনে পেছনে বিরাট জনতা। সেন্ট জেমস পার্কের ছোটো ছোটো ছেলেরা খেলা ফেলে দিয়ে ছুটে আসে। থানার সামনে লোকে লোকারণ্য। রেলিঙের ওপর উঠে বাচ্চা ছেলেরা চাঁচায় ‘বন্দেমাতরম—লাল পাগড়ির মাথা গরম’। জোয়ারের জলের মতো জনতা ফুলে ফুলে ওঠে।

তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাত পুলিশ ভয় পেয়ে যায়। শুরু হয়ে যায় এলোপাথাড়ি লাঠিচার্জ। যে যেদিকে পারে ছুট দেয়। এমনি করে রোজ ছুটতে ছুটতে রাস্তায়াট চেনা হয়ে গেল।

একদিন কংগ্রেস আপিসের সামনে রোজকার মতো দাঁড়িয়ে আছি। নিয়মিত পাশের বাড়িতে শাঁখ বেজেছে। পুলিশ ঢুকে গেছে কংগ্রেস আপিসে। হঠাত দেখি দোতলায় ভলান্টিয়ারদের মধ্যখানে ফুলের মালা গলায় দিয়ে দাঁড়ানো—আরে এ যে আমাদের রামদুলালবাবু, আমরা যাঁর বাড়িতে থাকি! কী আশ্চর্য, উনি আবার কবে ডিরেক্টর হলেন?

বুকটা দশ হাত ফুলে উঠল। সকলের সঙ্গে গলায় গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলাম—রামদুলালবাবু কী জয়! এমন ভাব নিয়ে চারপাশে তাকাতে লাগলাম যেন ফুলের মালাটা আমার গলাতেই কেউ পরিয়ে দিয়েছে। না বলে পারলাম না—উনি হচ্ছেন আমাদের রামদুলালবাবু, চেনেন না? চারপাশে কেউ কথাটাকে তেমন আমল দিল না বলে একটু চুপসে গেলাম। আমার সঙ্গে চেনা আছে রামদুলালবাবুর, তাই লোকগুলোর অত হিংসে! আরেকজনের কাঁধে ভর দিয়ে মুখটা উঁচু করবার চেষ্টা করলাম, রামদুলালবাবু যাতে আমাকে দেখতে পান। হাসুন না একটু রামদুলালবাবু আমার দিকে তাকিয়ে। লোকগুলো একটু বুরুক কী রকম লোকের সঙ্গে আমার আলাপ। যার কাঁধে ভর দিয়ে উঠেছিলাম, সে-লোকটা এক বাটকা দিয়ে আমাকে ফেলে দিল। হাফ প্যান্টের ধূলো ঝেড়ে যখন উঠে দাঁড়ালাম, তখন পুলিশের ভ্যান চলতে শুরু করেছে।

তেলেভাজার দোকানের পাশে সাইক্লোস্টাইলে ছাপা বেআইনি বুলেটিন বিলি হচ্ছিল। এক কপি বুলেটিন কায়দা করে কোমরে গুঁজে বাড়ি ফিরে এলাম। পাড়ায় খবরটা দিতে হবে তো। খবর দিতে গিয়ে বেকুব বনে গেলাম। রামদুলালবাবু জেলে যাচ্ছেন, সে-খবর তো সকলেই জানে। কিন্তু আমাদের গালির এতবড়ো একটা গর্ব, পাড়ায় সেই উৎসাহ কই?

বাড়িতে যখন কেউ না থাকে, আমি আর কাকিমা ঘর অন্ধকার করে উন্নুনের আঁচে বেআইনি বুলেটিন পড়ি। ইংরেজের সিংহাসন টলোমল টলোমল করছে, স্বাধীনতা দূরে নয়। যত ভাবি তত আনন্দে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমাদের বাড়িওয়ালা জেলে গেছে আমাদেরই জন্যে, সারা দেশের ভালোর জন্যে। আর আমরা ঘরে বসে থাকব?

হঠাৎ একদিন কাকিমা বলে বসলেন, আমাকে নিয়ে চল—আমি জেলে যাব।

সারা কলকাতা খেপে উঠেছে।

রাস্তা দিয়ে হরদম পুলিশের ভ্যান যাচ্ছে। সরু জালের ভেতর দিয়ে একগাদা কালো কালো মাথা দেখা যায়। আর মুহুর্মুহু আওয়াজ ওঠে ‘বন্দেমাতরম’। বড়োবাজারের বিলিতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং, মদের দোকানে পিকেটিং। লোকের মুখে স্বদেশি ছাড়া আর কথা নেই। যেদিন ইঙ্গুল হয়, সেদিন মাস্টার-ছাত্র একসঙ্গে বসে তকলি কাটি।

খবরের কাগজ বন্ধ। কিন্তু তাতে খবর আটকে নেই। অলিগালির দেয়ালে লটকে দেওয়া হচ্ছে নতুন ধরনের খবরের কাগজ। কালো আর লাল কালিতে হাতে লেখা সংবাদপত্র। কোন রাস্তায় কোন মিছিলের ওপর পুলিশের লাঠি চলেছে, বাংলাদেশের প্রামে প্রামাণ্যে কোথায় কতদূর ছড়িয়ে পড়ল আগুন, জেলখানায় কী অমানুষিক অত্যাচার চলেছে—তার টুকরো টুকরো খবর। একদম নীচে লাল কালিতে লেখা—পড়ুন এবং নিজে কপি করে অন্যদের পড়ুন। কাগজ-পেনসিল হাতে নিয়ে এক দঙ্গল লোক সেই খবর টুকে নেয়। এমনি করে মুখে মুখে ছড়িয়ে যায় খবর।

রামদুলালবাবুর দাদা একদিন বললেন, দেখা করতে যাবে জেলখানায়?

আনন্দে আটখানা হয়ে সঙ্গে গেলাম। কেমন করে ঘুরে ঘুরে গেলাম মনে নেই। ট্রাম থেকে নামতেই সামনে লোহার প্রকাণ্ড সিং-দরোজা। সেপাইয়ের হাতে চিঠি দেওয়া হলো। হুকুম হলো ভেতরে ঢোকার। ইংরেজের জেলখানায় হেঁট হয়ে চুকতে যা রাগ হচ্ছিল। কিন্তু কী আর করা যাবে। আমরা একা নই, অনেকেই তো চুকছে।

আমরা চুকছি এমন সময় একটা কয়েদ-গাড়ি থেকে নতুন একদল বন্দি এসে হাজির। ‘বন্দেমাতরম’ শব্দে জেলখানা কেঁপে উঠল। একটু এগিয়ে বাঁ হাতের শেষ ঘরটায় বন্দিদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা। মেরোর ওপর সতরঞ্জি পাতা। ঘরভর্তি লোক। ঘরে একটি মাত্র টেবিল এবং চেয়ার। চেয়ারের ওপর যিনি বসে আছেন, তাঁকে দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। কাগজের ছবিতে হুবহু এই মুখ দেখেছি—সুভাষচন্দ্র বসু না? কয়েদ-গাড়ি থেকে একটা করে দল এসে নামছে আর তিনি ছুটে বাইরে যাচ্ছেন। তাদের জড়িয়ে ধরে বলছেন, তোমরা এসেছ?

জাল দেওয়া জানলার কাছে ভেতরের বন্দিরা জেলওয়ার্ডারদের চোখ এড়িয়ে মাঝে মাঝে এসে ভিড় করছিল, কিন্তু সেপাইদের চোখ পড়তেই হৃড়মুড় করে তারা সেখান থেকে সরে যাচ্ছিল। একজন ডাক দিল—শোনো খোকা! ‘খোকা’ বলাতে আত্মর্যাদায় লাগলেও জানলার কাছে গেলাম। ‘বাড়িতে আমার বুড়ি মা আছে, কেঁদে

কেঁদে মরে যাচ্ছে—তুমি খবর দিও আমি ভালো আছি।' বাড়ির নম্বর নিয়েছিলাম কিন্তু কুঁড়েমি করে শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠেনি। আজও তা বিঁধে থাকা কাঁটার মতো মাঝে মাঝে খচখচ করে ওঠে।

জেলের দরোজা পেরিয়ে যেন কেমন কেমন লাগল। রাস্তায় রাস্তায় ফুঁসে-ওঠা মানুষগুলো হাজির হচ্ছে এসে জেলখানার অন্দরার গুহায়। কী পাবে তারা এখানে?

আমনি মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠল মার কাছে শেখা গান: ও তোর শিকল পরা ছল। শিকল পরে শিকলরে তুই করবি রে বিকল।

বুবালাম না। তবু মনটা একটু তাজা হলো।

তিন মাস অসুখে আচেতন ছিলাম। এর মধ্যে বাসা বদল হয়েছে। উঠে এসেছি ফিরিঙ্গি পাড়ায়। কানাগলি ছেড়ে বউবাজারের বড়ো রাস্তায়। যে রাস্তায় থাকেন ডাকাতে কালী।

কাকিমা দেখলাম একদম বদলে গেছেন। ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি ঘোরতর সংসারী। কাঁধ থেকে ভাবপ্রবণতার ভূত একেবারে নেমে গেছে। রাস্তায় কঢ়িৎ কদাচিত্ত জাল-দেওয়া কয়েদ-গাড়ি চোখে পড়ে।

ভাঁটার টানে জোয়ারের জল নেমে যায়। টলতে টলতে রাস্তায় বার হই। কই কোথায় সেই ফেনিয়ে-ওঠা জনসমুদ্র? পার্কে মিটিং নেই, বড়োবাজারে পিকেটিং নেই। একেবারে নতুন চেহারা শহরের। দেখলে কে বলবে এই শাস্ত নিরীহ কলকাতা দু-দিন আগে রেগে খুন হয়ে উঠেছিল।

সব কিছুই বদলে গেছে। মনেই হয় না সামনের বড়ো রাস্তা কোনো দিন বন্দেমাত্রম শব্দে মুখর হয়েছিল। ট্রামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে বাস। ভিড় আছে রাস্তায়—স্নানমুখ অফিসঘাতীর অফুরন্ত মিছিল।

চিনেপাড়া থেকে চোলাই-করা বড়ো বড়ো মদের জালা ধরে নিয়ে আসে আবগারি পুলিশ। দু-বগলের নীচে ক্রাচ নিয়ে ঘোরে খোঁড়া ইনফর্মার। গাঁজা-আফিঙ্গের বেআইনি আড়াগুলো তার নখদর্পণে। ধরা-পড়া লোকগুলোর জামিন হয় জুতোর দোকানের মালিং টিং-থাই। সারাদিন এইসব দাঁড়িয়ে দেখি।

বিকেলে গিয়ে বসি পারশি চোখের ডাক্তারের চশমার দোকানে। রাস্তায় মোটরের নম্বর গুনি। এত লোক তবু ফাঁকা ফাঁকা লাগে এই শহর।

পাশে দাঁতের হাসপাতালের নীচে ইহুদিদের যেন কী একটা পরব। জানলার ফাঁক দিয়ে গরম গরম হাতে তেরি রুটি বিলি হচ্ছে দুর্ঘ ইহুদিদের জন্যে। ঘুড়ির জন্যে মাঝে মাঝে লগি হাতে রাস্তায় ছুটি। বাদাম আখরোটের দোকানের সামনে সত্ত্ব নয়নে তাকিয়ে থাকি। হাঁটতে হাঁটতে ফুটপাথের চৌখুপি ঘর গুনি।

গির্জায় রবিবারের ইঙ্গুল বসে। সকাল বেলায় মাঝে মাঝে গেটের সামনে পেরি সাহেব কেরোসিন কাঠের বাক্স ওপর দাঁড়িয়ে ভাঙা বাংলায় অ্যাকর্ডিয়ন বাজিয়ে খ্রিস্টসংগীত করেন আর তাঁর সাঙ্গে পাঞ্জেগারা বিলি করে লাল মলাটের চাটি বই 'মাথিলিখিত সুসমাচার'।

হঠাতে একদিন বাড়ির সামনে দেখা হয়ে গেল জেলফেরত পুরোনো বাড়িওয়ালা রামদুলালবাবুর সঙ্গে। গোমড়া মুখ দেখে মনে হয় না গলায় কোনোদিন আবেগে তরে মালা দেওয়া হয়েছিল। দুঃখ করে বললেন দাদুকে—আর বলেন কেন? মিছিমিছি জেলে যাওয়া হলো। কর্পোরেশনে নতুন নিয়ম হয়েছে জেলে গেলে আর মাইনে বাড়বে না। কী মুশকিল বলুন তো? শুধু শুধু কটা মাস জেল ভোগ করতে হলো।

ও ! এই জন্যে জেলে গিয়েছিলেন ? মাইনে বাড়াবার জন্যে ?

নিজের ওপরই রাগ হলো। কী বোকা আমি ! এই লোকটার জন্যে একদিন গর্ব করে বেড়িয়েছিলাম !

ফুটপাথে ছবি বিক্রি হয়—ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দন্ত, যতীন দাসের ছবি।

নেভেনি আগুন। ছাই-চাপা হয়ে সে আগুন জ্বলছে। উল্কার মতো মাঝে মাঝে আকাশ থেকে খসে পড়েছে—মেছুয়াবাজার, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় আগুনের হলকার মতো একেকটা খবর। বোমার আওয়াজে কেঁপে ওঠে লালদিঘির দণ্ডর। সারা বাংলাদেশকে কাঁদিয়ে ফাঁসি যায় রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, দীনেশ মজুমদার, আরও অসংখ্য শহিদ।

মাঝে মাঝে এক-একটা দমকা হাওয়ায় কলকাতার গুমোট ভাঙে। তার পরই সব চুপচাপ। সন্ধেবেলায় রাস্তায় হেঁকে যায় ‘তপসে মাছ’, ‘বেল ফুলের মালা’, ‘কুলপি বরফ’। জেল থেকে ফিরে এসে শশাঙ্কের খদ্রধারী দাদা মিলের ধূতি পরে কলেজে যায়, ঘরের দরজা এঁটে পরীক্ষার জন্যে পড়ে।

বাইরের ঘরে বাবার কাছে আসেন এক সরকারি উকিল। তিনি বলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঁঠনের মামলার গল্প। ঘরে আর কারও থাকার হুকুম নেই। পর্দার পেছনে দাঁড়িয়ে আমি আর দাদা লুকিয়ে শুনি। ভদ্রলোক বলেন একেবারে মশগুল হয়ে। যেন তিনি সূর্য সেনেরই দলের লোক। গণেশ ঘোষের লেখা কবিতা সুর করে পড়েন। কঙ্গনা দন্তের ডাইরি থেকে পাতার পর পাতা মুখস্থ বলে যান। মুগ্ধ বিস্ময়ে আমরা বসে শুনি। অসাধারণ বলার ক্ষমতা ভদ্রলোকের।

কাহিনি যে কখন শেষ হয়ে যায় খেয়ালই থাকে না। মাঝে মাঝে পর্দার পেছনে ধরা পড়ে গিয়ে বকুনিও থাই।

পাহাড়তলী, ধলঘাট, কালারপোল—যেন কুরুক্ষেত্রের একএকটা উপাখ্যান। সূর্য সেন আর অম্বিকা চুরুক্তী, অনন্ত সিং আর গণেশ ঘোষ, কঙ্গনা দন্ত আর প্রীতি ওয়াদেদার যেন কুরুক্ষেত্রের এক একজন মহারথী। নেই তাদের অক্ষোহিণী সেনা। তারা বোঝাতে চেয়েছিল অসির বিরুদ্ধে চাই অসির ঝঞ্জনা।

সরকারি উকিল চলে যাবার পর রাগে হাত নিসিমিস করে। লোকটা একজন পয়লা নম্বরের ভণ্ড। মুখে এক, মনে এক। গল্প বলবার সময় দেশকে ভালোবাসার কত কথাই না সে বলে। সূর্য সেনদের জন্যে দরদ যেন তার উথলে উঠছে। কিন্তু এর পরই বাড়ি ফিরে গিয়ে লোকটা বাংলার বীরদের ফাঁসিকাঠে ঘোলাবার জন্যে আইনের পাতা ঘাঁটতে বসবে। এরা মানুষ না আর কিছু ?

আমি আর দাদা দেয়ালের ছবির কাছে প্রার্থনা জানাই—ঠাকুর, সূর্য সেনকে ওরা যেন খুঁজে না পায়।

রাস্তায় গণৎকারের কাছে হাত দেখাতে বসি— দেশ স্বাধীন হবে কবে ? গণৎকার গন্তীর হয়ে আঁকজোক করে বলে—আড়াই বছর পরে।

তারপর কত আড়াই বছর কেটে গেল। গণৎকারদেরও কত ভোলাই না বদলাল। তারা কখনও বেকারদের হাত দেখে বলল চাকরি হবে কিনা, কখনও ভয়ে-পালানো লোকদের বলল জাপানি বোমায় প্রাণ যাবে কিনা। কলকাতার মরা গাঙে বার কয়েক ছোটো বড়ো ঢেউ এসে লাগল বটে, কিন্তু বান ডাকল না আর।

কাকার জুট আপিসের চাকরি গেল। সরকারি আপিসে বাবার মাইনে কাটা গেল। ছা-পোয়া সব সংসারেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল অভাবের আগুন। সস্তা ভাড়ায় দেড়খানা ঘরে কোনোরকমে মাথা গুঁজে কোণঠাসা হয়ে উঠে যেতে হলো শহরতলীতে।

এই ক-বছরে আপন করে নিয়েছে এই শহর। আকাশের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই অনেকদিন। বিকেলবেলায় ট্রাম-রাস্তায় এসে মাঝে মাঝে চকিতে দেখা হয়ে যায়—তাও পুরো আকাশ নয়, কুমড়োর ফালির মতো এক একটা টুকরো। বিকেলবেলায় পথ-চলতি লোকের ভিড়ে মিশে যাই। মজা লাগে লোকের মুখের দিকে তাকাতে। তাদের ভাবনা ফুটে ওঠে মুখের বিচ্ছি রেখায়। কারো মুখে বিরস্তির ভাব। কারও মুখে দৃশ্যস্তর ছায়া। কারো চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। উলটো করে জামা পরেছে কেউ। একা চলতে চলতে কারো হয়তো মনে পড়ে গেছে খুব হাসির একটা কথা। আপন মনে হেসে উঠে হঠাতে লজ্জা পেয়ে চারিদিকে তাকিয়ে নেয়—কেউ দেখে ফেলেনি তো? একই রাস্তায় পাশাপাশি চলে এমনি নানা জাতের রকমারি মানুষ।

চেহারা বদলে যাচ্ছে শহরের। অজগরের পেটের মতো ফুলে ফেঁপে ওঠে কলের কলকাতা। জমিজায়গা হারিয়ে শহরে আছড়ে পড়ে গাঁয়ের মানুষ—কাজের জন্যে, দু-মুঠো ভাতের জন্যে। বেঙ্গুলার ভাসানে যে ছেলেটা লখিন্দর সাজত, সে এখন চিনির কলে কাজ নিয়েছে।

কালাপানি পেরিয়ে হঠাত খবর এল আন্দামানের বন্দিরা অনশনে। চোখের আড়াল হবার পর যারা ভুলে গিয়েছিল এতদিন, তাদের বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। ইঙ্গুল-কলেজ ছেড়ে ছেলেমেয়ের দল বার হয়ে এল রাস্তায়। তাজা রক্তে হাত রাঙাল লালমুখো সার্জেন্ট আর লাঠিয়াল পুলিশ। তবু ফুঁসে ওঠা জনতার সেই ঢেউ বন্দিদের ছিনিয়ে নিয়ে এল স্বদেশের মাটিতে।

ঢেউ আবার মিলিয়ে যায়। থমথম করে কলকাতার রাস্তা। মাঝে মাঝে মিটিং হয় পাকে। ঢায়ের দোকানে তর্ক চলে। রাস্তায় বিলিক দিয়ে যায় একটা নতুন নিশান—লাল শালুর তৈরি। তার মাঝখানে কাস্টে আর হাতুড়ির হাতে-হাত-দেওয়া ছবি। যারা সেই নিশান বয়ে নিয়ে যায়, তারা কারখানার মজুর। হেঁকে বলে তারা—ইনকিলাব জিন্দাবাদ। হাত মুঠো করা তাদের আওয়াজ যেন বজ্রের কানেও তালা ধরায়। মুখে মুখে রটে যায় একটা নাম—কমরেড লেনিন। একটা তারিখ—পয়লা মে।

যুদ্ধ বাধবে বাধবে করে একদিন বেধে যায়। ঘরের কাছে এগিয়ে আসে তার তুংকার। অন্ধকারে দেয়ালে দেয়ালে কারা এঁটে দেয় গোটা হরফের নিষিদ্ধ ইস্তাহার।

অন্ধ রাগে ফেটে পড়ে কলকাতার রাস্তা। বিয়ালিশ সালের আগস্টের কলকাতা। ট্রাম পুড়ছে। এবার লাঠি নয় গুলি চলছে রাস্তায়। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের ভয়ড়ের নেই। ইট হাতে নিয়ে বন্দুকের সামনে দাঁড়াচ্ছে। বলছে ইংরেজ, ভারত ছাড়ো।

দিঘিদিক জ্ঞানশূন্য সেই আগুন জুলতে জুলতে একদিন ছাই হয়ে নিভে গেল।

কলকাতার ফুটপাথে সোনিন মরা মানুষের ভিড়ে পা পাতা যায় না। গ্রামগুলো সব পেটের জ্বালায় উঠে এসেছে শহরে। মড়া ডিঙিয়ে রাস্তা হাঁটতে হয়। বাতাসে দুর্গন্ধি। নিশাস নিতে কষ্ট হয়। পচন ধরেছে কলকাতার শরীরে।

চায়ির গোলার ধান জমিদার-জোতদারদের মুঠোয়। জেলেদের নৌকো সরকারের হাতে আটক। গাঁয়ে চাল নেই। অভাবী মানুষগুলো তাই অঘের সম্মানে ছুটেছিল শহরের দিকে।

গাঁয়ের বীজ বোনা মাঠে যখন ধানের শীষ আবার পেকে উঠল, তখন শোকে-তাপে-পোড়া মানুষগুলো আবার ফিরে গেল গাঁয়ে। মায়েরা গেল কোল খালি করে, মেয়েরা গেল হাতের লোহা ঘুচিয়ে।

যেমন ছিল তেমনি থাকল কলের কলকাতা। চালের দোকানে কিউ, কাপড়ের দোকানে কিউ। আলো-নেভানো রাস্তির। দিনের বেলায় জাপানিরা বোমা ফেলে গেল ডালহাউসি আর খিদিরপুরে। মাছির মতো বাঁকে বাঁকে মরল ডকের মজুর।

তবুও কোনো সাড়া নেই কলকাতার। মাঝে মাঝে দু-চার বার চোখ খুলে তাকালেও মুখ বুঁজে ঝিম মেরে পড়ে থাকল কলের কলকাতা।

রাস্তায় রাস্তায় আলোর চোখ থেকে খসে পড়ল ঠুলি। লড়াই শেষ। বুঁজিয়ে দেওয়া হল গড়খাই। মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হলো ব্যাফলওয়াল। লালকেঁজ্জায় বন্দি হল আজাদ হিন্দ ফৌজ।

হঠাতে শহরের কী হলো কে জানে?

ক্লাইভ স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে আছি। ছাত্রদের এক বিরাট মিছিল। সেই মিছিলে হাত ধরাধরি করে উঠেছে তিন-তিনটে নিশান—কংগ্রেস, লিগ আর ছাত্র-নওজোয়ানের। রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে মাথায় হেলমেট লাগানো টমিগান আর রাইফেলধারী পুলিশ।

দু-পাশে বড়ো বড়ো আকাশ-ছোঁয়া ইমারত। ডাকাত ক্লাইভের বংশধর শ্বেতাঙ্গ বোম্বেতেদের বড়ো বড়ো সাইনবোর্ড ঝুলছে বাড়িগুলোর গায়ে। চটকল আর ব্যাংক, খনি আর বাগান, জাহাজ আর রেলের সওদাগরি অফিস। ওপরতলার জানলা দিয়ে ক্রুদ্ধ চোখে কালা আদমিদের উদ্ধত মিছিলের দিকে তাকিয়ে আছে ধনকুবের বড়ো বড়ো সাহেব। তাদের আশেপাশে হাজির দু-চারটে কালো মুখ—কোটিপতি মাড়োয়ারি আর গুজরাটি বেনে।

হঠাতে সামনের সশস্ত্র পুলিশ বেটন হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল মিছিলের ওপর। গর্জে উঠল কাঁদুনে বোমা। রাস্তার ওপর পুথিপত্রের ছেঁড়া পাতাগুলো ছড়িয়ে রস্তাক্ষেত্রে দেহগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে পিছু হটে গেল বাচ্চা ছেলেদের মিছিলে। যাবার সময় শুধু চেঁচিয়ে জানান দিয়ে গেল—আবার ফিরে আসব।

সন্ধের আগে সারা শহরে রটে গেল সেই খবর। রাগে রী রী করে উঠল তামাম শহর কলকাতা।

অলিগনি থেকে, বস্তি-মাটকোঠা থেকে পিল পিল করে বেরিয়ে এল মানুষ। আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলছে চোখ। যে যা পেয়েছে, তাই নিয়ে দাঁড়িয়েছে রাস্তায়। সে-রাত্তিরে গুলি চলল মেঘোবাজারের মোড়ে।

তারপর বেপরোয়া কয়েকটা দিন, রাগে দিশেহারা কয়েকটা রাত্তির।

ডাস্টবিনগুলো এনে দাঁড় করানো হলো রাস্তার মাঝখানে। তৈরি হলো নিরস্ত্র জনসাধারণের ব্যারিকেড। সারা শহর ধোঁয়ায় ধোঁয়া। ইংরেজের যেখানে যা চিহ্ন, যেখানে যা প্রতীক—তা মুছে দেবার জন্যে পাগল হয়ে উঠল শিকল-পরা মানুষ।

ভয়ে গর্তে তুকে গেছে লালপাগড়ি পুলিশ। মিলিটারির হাতে দেওয়া হয়েছে কলকাতাকে সামাল দেবার ভার। লাঠিকে হাতিয়ে দিয়ে বন্দুক হয়েছে রাজা।

ওয়েলিংটনের মোড়ে, হাজরার মোড়ে টমিগান, ব্রেনগান বাগিয়ে ওত পেতে বসে আছে গোরা পল্টন।

মিলিটারি লরির একা যাবার উপায় নেই। তাই রাইফেল উঁচিয়ে চলে দলবাঁধা কনভয়। তবু রেহাই নেই। পুঁচকে ছেলেরা হামাগুড়ি দিয়ে ছুটে গিয়ে ঠিক আগুন লাগিয়ে দেয়। শিখে নিয়েছে তারা সমস্ত প্যাঁচ। গুলি ছুঁড়লে থামের পাশে আড়াল নেয়। গুলি লাগলে ‘জয় হিন্দ’ বলে উলটে পড়ে মাটিতে।

সে এক দুরস্ত লড়াই। বন্দুকের মুখোমুখি হয় দুঃসাহসী ইট আর শুধু-হাত। লড়াই চলে পাঁচমাথা আর মানিকতলায়, লড়াই চলে পোড়াবাজার আর রসা-রাসবিহারীর মোড়ে।

সার-সার মিলিটারি লরি পুড়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের বিরাট চওড়া রাস্তায়; পুড়ে সাহেবদের চা কোম্পানির গাড়ি। ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে আছে গোটা তল্লাট। মাঝে মাঝে সাঁজোয়া গাড়িতে সর্বাঙ্গ ঢেকে হুস হুস শব্দে ছুটে

যাচ্ছে রাইফেলধারী গোরা পল্টন। গুলি চলছে বেপরোয়া। তবু রাস্তায় ভিড় কমে না। যেখান থেকে যে পেরেছে খসিয়ে নিয়েছে বড়ো বড়ো লোহার ডান্ডা। মাটিতে ঘেঁস্টানি লেগে তাতে হিস শব্দ উঠছে।

ময়লা-কাপড়-পরা অগণিত মানুষ দাঁড়িয়ে। তারাই আজ রাস্তার রাজা। তাদের বিনা অনুমতিতে কোনো গাড়ির যাবার হুকুম নেই। যে-কোনো গাড়ি দাঁড় করাচ্ছ। জরুরি কাজ আছে বোঝাতে না পারলে ফিরিয়ে দিচ্ছে।

ছেলের হাত ধরে বাপ দাঁড়িয়ে আছে। গুলি চলুক পরোয়া নেই। ছেলের হাতের মোয়া নয় স্বাধীনতা। শয়তানের হাত মুচড়ে ছিনয়ে নিতে হবে দেশের স্বাধীনতা, ফুটপাথে ভিড় জমিয়ে খেলা দেখাত যে লোকটা, চৌরঙ্গির রেস্তেরাঁয় বয়ের কাজ করত যে ছেলেটা, শেয়ালদার বাজারে যে লোকটা ঝাঁকামুটের কাজ করত, যে ছেলেটা হোয়াইটওয়ের তলায় বসে জুতো বুরুশ করত আর বলত এমন পালিশ হবে বাবু জুতোয় মুখ দেখতে পাবেন—তারা সবাই এসে দাঁড়িয়েছে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের রাস্তায়।

কার্জন পার্কে তিলধারণের জায়গা নেই। গুর্খা আর গোরা পল্টন যত পা পেছোয়, ক্ষুর্ধ জনসমুদ্র তত পা এগোয়। ট্রামের গুমটির কাছাকাছি আসতে পারলেই বিলিতি হোটেল আর দোকানগুলোর মোটা কাচ ইট লেগে বান বান করে ভেঙে পড়ে।

ধর্মতলার চৌমাথা থেকে দূরে দেখা গেল একটা মিছিল। লাল, সবুজ আর তিনরঙা নিশান গিঁঠ দিয়ে বাঁধা। এগিয়ে এল মিছিল। যাবে দক্ষিণে। হঠাৎ তিনটে ছুটন্ত মিলিটারি ট্রাক রাস্তার পাশে থেমে গেল। লাফ দিয়ে নেমে পড়ল তিন গাড়ি পল্টন। রুখে দাঁড়িয়ে বুক টিপ করে তারা রাইফেল উঁচিয়ে ধরল। খবরদার! আর এক পা এগিয়েছো কি...

রুদ্ধ নিশাসে দাঁড়িয়ে আছি। কী করবে মিছিলের আগের লোকগুলো? এগিয়ে যাবে? গুলির মুখে প্রাণ দেবে? ‘জয়হিন্দ’ আওয়াজ তুলে বুক টান করে লোকগুলো পা বাড়াল সামনের দিকে। কী হলো? বীরপুঁজির পল্টনেরা যে সভয়ে সরে দাঁড়াল দুপাশে! গুলি করার হুকুম ছিল, কিন্তু সামনাসামনি দাঁড়িয়ে সাহসে কুলোয়নি তাদের।

মাঝে মাঝে বাঁকে গুলি চলছে কার্জন পার্কের দিকে।

তারই মধ্যে একটি বাচ্চা ছেলে দেখি একটা লাঠির আগায় ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়িয়ে মশাল জ্বালিয়েছে। মশালটা নিয়ে আস্তে আস্তে সে রাস্তা পার হলো। সামনে মিলিটারি ট্রাক দাঁড়ানো। তবু ভুক্ষেপ নেই। কাছেই সাহেবদের একটা হোটেল। একতলার দরজা-জানলা আঁটা। ছেলেটা হাতে মশাল নিয়ে থাম বেয়ে ওপরে উঠল। তারপর জ্বলন্ত মশালটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ভেতরে। দাউ দাউ করে আগুন জলে উঠল। সাহেবদের ভয়ার্ট চিক্কার। তারপর ছেলেটা থাম বেয়ে আস্তে আস্তে নীচে নেমে এল। মিলিটারি লরিটার দিকে রুদ্ধ চোখে একবার তাকিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে যখন সে চৌমাথায় এসে পৌঁছাল, তখন লুঙ্গিপরা এক ফলওয়ালা ঝুড়ি হাতে ছুটতে ছুটতে এসে তার হাতে একটা কমলালেবু গঁজে দিয়ে গেল। কমলালেবুটা ছাড়াচ্ছে এমন সময় পেছন দিক থেকে গুলির একটা শব্দ। ছেলেটা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মিনিটে একজন করে বুলেট-বেঁধা লোক আসছে। কাউকে কাউকে হাসপাতালে না নামিয়ে সোজা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মর্গে। যাদের আল্লায়স্বজন আছে, তাদের ঘিরে আকাশবাতাস জুড়ে বুকফটা চিক্কার উঠছে।

একজন ধূতিপাঞ্জাবি পরা লোক চুকতে চাইছিল ইমাজেন্সির ভেতর। ভলান্টিয়াররা কিছুতেই চুকতে দেবে না।

— দেখুন মশাই, ভিড় বাড়াবেন না।

লোকটা ও নাহোড়বান্দা।—আমার দরকার আছে।

ভলান্টিয়ার ছেলেটি এবার চটে গেল। কী দরকার শুনি?

লোকটা খুব শাস্তিভাবে বলল, গুলি লেগেছে আমার।

গুলি লেগেছে? দেখি?

লোকটা পেছন ফিরল। পিঠের দিকে জামা আর কাপড় রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কড়ে আঙুল সমান ছাঁদা হয়ে গেছে পিঠটা।

বলেননি কেন এতক্ষণ? হেঁটে এসেছেন কেন?

—বলে হস্তদন্ত হয়ে ভলান্টিয়ার ছেলেটি খাটের ওপর লোকটিকে শুইয়ে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে গেল।

গুলি খোয়ে লোকটি ভয় পায়নি। তার লজ্জা গুলিটা বুকে না লেগে পিঠে এসে লেগেছে বলে। পিঠে গুলি দেখে লোকে না ভেবে বসে সে ভয়ে পালাচ্ছিল।

রাজাবাজার বস্তিতে শহিদ হলো কদম রসূল।

পরদিন সন্ধেবেলা বস্তির সবাই দড়ির ভাঙা খাটিয়াগুলো রাস্তায় টেনে মিটিং করল। সবাই দু-চার পয়সা করে চাঁদা দেবে। বাঁচিয়ে রাখবে তারা রসূলের অসহায় কাচ্চাবাচ্চাদের। পয়সা দেবে যারা সারাদিন রিক্সা টানে, বিড়ি বাঁধে, ফেরি করে জিনিস বেচে, কলকাখারনায় কাজ করে। মরদ ছিল কদম রসূল। গ্যাস কোম্পানির ইউনিয়নের একজন পান্ডা ছিল সে। মালিকের চোখ-রাঙানিকে কখনও ভয় করেনি। দিল ছিল তার। বস্তির সবাই তাকে ভালোবাসে।

কদম রসূলের বাচ্চা ফুটফুটে মেয়েটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সকলের মুখের দিকে। কোথায় গেছে তার আবাজান?

শুধু মানুষ খুন নয়, জানোয়ারগুলো লুটের রাজত্ব চালায়। পানের দোকান থেকে ছিনিয়ে নেয় টাকাপয়সা, মনিহারি দোকান থেকে দামি জিনিস, বস্তি থেকে হাঁস-মুরগি।

রাস্তারে জুলন্ত আগুনের আলোয় তারা রাইফেল আর টামগানের মুখে শিকার করে বেড়ায় নিরস্ত্র মানুষ—গুলি লেগে দোতলার বারান্দায় লুটিয়ে পড়ে ছ-বছরের কচি মেরে।

যখন উঠে দাঁড়াল সারা শহর, বসে থাকলেন পাকা-চুল নেতারা। শুধু বসে থাকলেন না, গুরু দুর্নাম দিয়ে বসিয়ে দিলেন তাঁরা গোটা শহরের মানুষকে।

আস্তে আস্তে আলগা হয়ে গেল মুঠো। ট্রামগাড়ি আবার চলতে লাগল। যেখানকার সেখানে ফিরে গেল ডাস্টবিন। পান খোয়ে ঠোট লাল করে লালদিঘির দিকে অফিসিয়াত্রির দল আবার পা বাঢ়াল।

কিন্তু ইংরেজের টনক নড়ে গিয়েছিল। সেপাই সাস্ত্রীও আর তার বাধ্য নয়। এবার মানে মানে সরে পড়াই ভালো। নইলে কপালে অনেক দুঃখ।

ইংরেজ গেল। কিন্তু যেতে যেতে রাস্তায় বেশ কিছু কঁটা ছাড়িয়ে দিয়ে গেল।

তারপর বছর না যেতে দেশ ভাগ। ভাইয়ে ভাইয়ে খুনোখুনি চলল কলকাতার রাস্তা জুড়ে। মৃত্যুকে এত বীভৎস হতে কেউ কখনও দ্যাখেনি। ভরে গেল রাস্তা চালচুলোহীন উদ্বাস্তু মানুষের ভিড়ে।

ইতিহাস নয়। এইখানে শেষ হলো কলকাতার গল্প।

দিন যায়, বছর যায়। কেউ বলে শেষ করতে পারে না কলকাতার গল্প। ট্রামের তারে, বাসের চাকায় নিজেই গল্প বলে যায় কলের কলকাতা। রাস্তায় রাস্তায় আগনের অক্ষরে ইতিহাস লেখে, আবার নিজেই মুছে দেয়।

কলকাতার ইটের পাঁজরে লুকিয়ে আছে ভালোবাসার ঝরনা। সে ঝরনা কখনও শুকোয় না। যতদিন মানুষ আছে এই শহরে, ততদিন অফুরন্ত এই ভালোবাসার ঝরনা।

মাঝে মাঝে প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে সেই ভালোবাসা। জীর্ণ দালানগুলোর ভিত নড়ে ওঠে; আকাশে বাতাসে ওঠে বজ্রের নিনাদ। যতদিন হাতের সব শিকল ভেঙে না পড়ছে, রাগ শান্ত হবে না কলকাতার।

শিয়ালদহ আর বড়বাজারের মোড়ে রাস্তার ঠিক মাঝানে দাঁড়িয়ে নাক-বরাবর পশ্চিমে তাকিয়ে কী দেখতে পাও? ধোঁয়াটে দালান ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু ক-বছর আগেও ঠিক ওইখানে দাঁড়ালে সোজা দেখতে পেতে হলওয়েল মনুমেন্ট। পাথরের খোদাই করা ইংরেজদের মিথ্যে ইতিহাস। কলকাতার মানুষ সেই জাল ইতিহাসকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে আন্দোলনের জোয়ারে।

কিন্তু আজও ময়দানের পাথরের বহু স্তম্ভে, মনুমেন্টের গায়ে ভারতবাসীর মুখে চুনকালি-দেওয়া সান্নাজ্যবাদের দন্ত বজায় আছে। ক্লাইভ স্ট্রিটের নাম বদলালেও ক্লাইভের বংশধরেরা আজও চক্রবিলানো বড়ো বড়ো দালানে বহালতবিয়তে বেঁচে আছে। চা-বাগান, চটকল, কয়লার খনি থেকে শুয়ে খাচ্ছে তারা কালা আদমির রস্ত। আর দেশি দালালরা তাদের ঝাঁটো পাতা চাটছে।

কাগজ পড়ি আর রাস্তিরে মাঝে মাঝে উড়োজাহাজের শব্দে ঘূম ভেঙে যায়। যদি ঘূর্ষ হয়? বোমার আঘাতে গুঁড়িয়ে যাবে পড়ো পড়ো দেয়ালের শহর কলকাতা। ধুলোর মধ্যে ধুলো হয়ে যাবে এ শহরের তামাম মানুষ।

ঘূর্মিয়ে ঘূর্মিয়ে আবার স্বপ্ন দেখি: আলোয় আলো হয়ে আছে সারা কলকাতা। শাস্তির পতাকা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় চলেছে মানুষের বিচিত্র মিছিল। মাথার ওপর উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা পায়রা। যত তারা এগোচ্ছে দুপাশে মাথা তুলছে নতুন নতুন দালান। চেহারা বদলে গেছে শহরের। চেহারা বদলে গেছে মানুষের। চোখেমুখে উপচে পড়ছে তাদের স্বাস্থ্য। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা হাতে ফুল নিয়ে হাসছে।

ঘূম ভেঙে কলকাতাকে বলি: স্বপ্নের সেই সুন্দর দিন চলো এগিয়ে আনি।





## জগদল পাথর

কলকাতা থেকে নাকবরাবর রাস্তা গেছে সোজা উত্তরে। ব্যারাকপুর রোডের দুপাশে যদি তাকাও দেখবে লম্বা পাঁচিলে গান্ডি দেওয়া উঠোনের মধ্যে দৈত্যের মতো ইমারত। কালিবুলি মাখা কিন্তু তকিমাকার চেহারা। করোগেট টিনের ছাঞ্চার ফুটো করে আকাশের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে অসংখ্য সরু সরু চিমনি।

সামনে লোহার প্রকাণ্ড ফটক। তাতে একটা মাত্র মানুষ গলে যাবার মতো ছোট এতটুকু ফুটো। বাইরে তাজা কার্তুজের বেল্ট পৈতের মতো গলায় ঝুলিয়ে টুলের ওপর বসে বসে বিমোচ্ছে বন্দুকধারী পাহারা। ফটকের সামনে ধূলোর মধ্যে পা ছাড়িয়ে বসে আছে তেলেভাজা-মিঠাই আর চানাচুর-গরম। চারপাশে এঁটো শালপাতার জঙ্গল।

কারখানার গা ঘেঁষে এবড়ো-খেবড়ো হাড়-বার-করা গলি। দুপাশে তার কুলিলাইন। মোড়ের ওপর ছাইপাঁশের উঁচু ঢিবি।

ব্যারাকপুর রোড কোথাও কোথাও কাটা পড়েছে রেলের লাইনে। মালগাড়ি যাবার রেল পাতা রাস্তায়। চট্টের বস্তা পাড়ি দেবে সাত সমুদ্র তেরো নদী। সাত রাজার ধন মানিক আসবে দেশে—ক্লাইভ স্ট্রিটের বিদেশি সওদাগর আর তাদের দেশি মৃৎসুন্দিরের পকেটে। একগলা জলে দাঁড়িয়ে যারা বুনেছে পাট আর সেই পাটের আঁশ দিয়ে বুনেছে যারা চট, তারা সবাই থাকবে না খেয়ে।

জগদলে পৌঁছোতে বেলা গড়িয়ে গেল। রাস্তায় জুলে উঠল আলো। কানে তালা ধরিয়ে কারখানায় কারখানায় বেজে উঠল ভঁো। হঠাতে রাস্তা লোকে লোকারণ্য। হাঁ হয়ে খুলে গেল কারখানার প্রকাণ্ড গেট। গলগলিয়ে বেরিয়ে এল রস্ত নিংড়ানো অসংখ্য মানুষ। পায়ে পায়ে উড়ছে কুয়াশার মতো দম আটকানো ধুলো। কাঁধে কাঁধ দিয়ে চলেছে বাঙালি-বিহারি-মাদ্রাজি-ওড়িয়া নানা জাতের মানুষ। চুলের সঙ্গে আটকে আছে চটের ফেঁসো। দূর থেকে ঠিক পাকা চুলের মতো দেখায়।

ইউনিয়ন অফিসে সত্য দাশের সঙ্গে দেখা। জগদলের ছেলেবুড়ো সকলেরই ‘মাস্টারমশাই’। এ অঞ্চলে মাস্টারমশাইকে চেনে না এমন লোক নেই। পরনে ময়লা একটা পাজামা। পায়ে গোড়ালিবিহীন ছেঁড়া কাবলি জুতো। গেঁফদাঙ্গির অভাবে খুবই ছেলেমানুষ দেখায়। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে হয়েও মাস্টারমশাই চটকলের মজবুরদের মধ্যে বেমালুম মিশে গেছেন।

মাস্টারমশাইকে নিয়ে জগদলের রাস্তায় বার হওয়াই মুশকিল। দুপাশ থেকে টানাটানি করে অসংখ্য লোক। সকলেরই দরকার মাস্টার মশাইকে। কারখানার সাহেব বড়ো বাড়াবাড়ি শুরু করেছে, একটা কিছু না করলেই নয়। ছাঁটাই চলছে অমুক কলে। ধর্মঘট না করলে চলছে না আর। ছুটির দরখাস্ত লিখে দিতে হবে একটা। এমনি হাজার দরকারে মাস্টার মশাইকে চাই। চা তাঁকে খেতেই হবে। নইলে রাগ করবে দেনকানলের রঘুয়া।

সবু একটা গলির মধ্যে দোকান। টিন দিয়ে ছাওয়া বাঁশের ঢাঁচের ঘর। বাইরের বারান্দা থেকে ঘরের মেঝে বেশ একটু নীচু। সারি সারি বেঞ্জি পাতা। ঘরে একটামাত্র দরজা। জানলার বালাই নেই। ঘরটা বেজায় স্যাঁচসেঁতে। মিলফেরত কুলির দল বেঞ্জিতে সজোরে ঠ্যাং তুলে সর্দার আর বাবুদের ওপর গায়ের ঝাল মেটাচ্ছে।

অ্যালায়েন্স মিলের বিমার সুখদেওয়ের সঙ্গে আলাপ হলো চায়ের দোকানে। রোগা কালো হাড়-বার-করা চেহারা। চোখ দুটো অস্ত্র চকচকে। সপ্তাহে সপ্তাহে যে মজুরি পাওয়া যায়, তাকে বলে হপ্তা। সুখদেও হপ্তা পায় আট-ন টাকা। মা-বাপ ছেলে-বড় নিয়ে আট জনের সংসার তাতে কিছুতেই চলতে চায় না। আধপেটা খেয়ে পাঁচদিনের চালে সাতদিন চালাতে হয়। তাও প্রতি চার সেরে আধ সের করে ইটের কুচো। খেয়ে খেয়ে পেটের ভেতরটা কংক্রিটে ঠাসা হয়ে গেছে।

ফতুয়ার পকেট থেকে পোস্টকার্ডে ক্ষুদে ক্ষুদে আক্ষরে লেখা একটা ভাঁজ করা চিঠি বার করে সুখদেও। দেশ তার উড়িয়্যায়। শ্রাবণ-আশ্বিনে ব্রাহ্মণী নদীর উপরো-উপরি দু-দুবার বানে ডুবে গেছে ধান আর রবিখন্দ। তাই বারবার করে যেতে লিখেছে। কিন্তু যাবে কেমন করে? দেনায় মাথার চুল পর্যন্ত বিকোনো। ঘরে যেতে গিয়ে ভিট্টেও শেষে লাটে ওঠাবে?

ভোর হতেই লাইনে লাইনে কাবলিওয়ালারা ঘোরে। কাবলি জুতোর মশমশ আর লাঠির ঠক ঠক শব্দে সবাই চমকে ওঠে। শুক্র, শনি, রবি—আঁত্পুরের নিমতলায় কিংবা কারখানার গেটে কুলিদের তারা পাকড়াও করে। বেশি কথার লোক নয় তারা। বুলি তাদের একটাই: ‘আসলি নেহি মাংতা, সুদ লাও।’ আসল চাই না, সুদ চাই। মাসে টাকার দু-আনা সুদ। দশ টাকা নিলে চার সপ্তাহে চার কিস্তিতে শোধ দিতে হবে আসলের দেড়।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে ডান হাতে ন-নম্বর গলি। ঢাঁচের দেয়াল কাত হয়ে হেলে পড়েছে। ঘর এফোড়-ওফোড় করে ভেতর অদ্বি ঢুকে গেছে রাস্তার নর্দমা। দরোজা বলে কিছু নেই। কুকুর আটকানোর জন্যে ছেঁড়া চটের শুধু পর্দা বুলছে। রাস্তা থেকে ঘরের মেঝে দু-তিন ফুট নীচু। চারদিকে ভনভন করছে মাছি।

একটু এগোলে নজরে পড়ে কোন এক সর্দারের হাল-ফ্যাশনের পাকা বাড়ি। ঘরে তার দু-তিনটে গোরুও আছে। নিজের দুটো মাটকোঠাও আছে, ভাড়া খাটায়।

সর্দারের হপ্তা পঁয়তিরিশ টাকা। হপ্তা যাই হোক, মাসে তার উপরি মেলে পাঁচ-ছশো টাকার এক আধলা কম নয়। গঙ্গার ওপারে মিলের বাবুদের এই বাজারেও নতুন নতুন কোঠা উঠছে; দোতলা বাড়ি তিনতলা হচ্ছে।

মেঘনা মিলের বেনারসির সঙ্গে আলাপ হলো রাস্তায়। সর্দারকে বাইশ টাকা ঘুষ দিয়ে বেচারা কাজে চুকেছিল। জুর গায়ে দু-দিন কামাই হবার পর জবাব হয়েছে।

কাজ যাবার ভয়ে অনিল জুর নিয়ে আর রামধনী মাজার ব্যথা নিয়েই কলে যায়। ঘুষ দিতে না পারলে ছুটি নেই। লেট হলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব।

একটু এগিয়ে অ্যালায়েন্স সাউথ লাইন ওরফে নয়া বাড়ি।

সুলেমান মিঞ্চার ঘরে গিয়ে উঠি। ছাঁচে-ঢালা পাঁচ-হাত লম্বা, দু-হাত চওড়া পায়রার ক্ষুদে ক্ষুদে খোপ। আট টাকা ভাড়া। একজনের পক্ষে এত ভাড়া মাসে মাসে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই একটা ঘরে ন-দশজন ঠাসাঠাসি করে থাকে। থাকা মানে কোনো রকমে চোখের দুটো পাতা এক করার মতো একটু জায়গা বেছে নেওয়া।

সুলেমান মিঞ্চার ঘরের মধ্যে তাকিয়ে মনে হলো এর চেয়ে ভালো খোলা আকাশের নীচে বেদের টেল। খানকয়েক ছেঁড়া উলিডুলি চট ছাড়া আর কিছুই নেই। ঘরে একটি মাত্র জানলা। বন্ধ থেকে সেটা কুলঙ্গির কাজ করে। সেখান থেকে খানকয়েক রং চটা কলাই করা সানকি আর টিনের কোটো। বাইরের দাওয়ার ওপর গনগন করে জলছে কাঁচা কয়লার উন্নুন। ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে আছে গোটা ঘর।

কম করে শ-পাঁচেক লোক থাকে এ-লাইনে। কেউ তাঁত ঘরে, কেউ সেলাই ঘরে, কেউ বা পাট ঘরে কাজ করে। ভোর হতে না হতে টাট্টিখানার সামনে মারামারি লেগে যায়। গোসলখানায় ছাতা পড়ে এমন পেছল হয়ে আছে যে পা পাতা যায় না। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে হামেশাই লোকের মাথা ফাটে। পাকাঘরের ঠিক কোল ঘেঁষে বারোয়ারি পেছাপখানা। বাড়ুদার দিনে একবার আসে। দুর্গন্ধে নাকে কাপড় দিতে হয়।

মোড়ে মোড়ে একটা করে চোখে ঠুলি পরানো বিজলি বাতির আকাশপ্রদীপ। কয়েক পা এগোলেই অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হয়।

ডবল খাটুনি খেটে বাইরে দড়ির খাটিয়ার ওপর ক্লাস্তিতে এলিয়ে পড়েছিল ইয়াকুব। দ্বারভাঙ্গায় দেশ তার। অন্ধকারে চোখ বুজে কী ভাবছিল জানি না। আমাদের সাড়া পেয়ে উঠে বসল ইয়াকুব। বলল—দেশে গ্রাম্যরে হাজার হোক আলো হাওয়া আছে। কিন্তু যার জোতজমি নেই, দেশে তার ঠাঁইও নেই।

অকল্যান্ত মিলের দক্ষিণে এক গলি দিয়ে আসছি। হঠাৎ মাস্টারমশাই থেমে গেলেন।

শুনছেন? মেকানিক গোপাল মাঝি কাশছে।

শব্দ শুনলাম। পাঁজর ফেটে দমকে দমকে কাশির বেগ উঠছে। দাঁড়িয়ে থেকে শোনা যায় না। নিজেরই যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

পাটঘরে পাটের আঁশ গলায় গিয়ে গলা সুড় সুড় করে। যক্ষারোগীদের কাশির সঙ্গে দলা দলা রক্ত ওঠে। পাশে যারা থাকে তারা দেখেও দেখে না। দু-দিন পর তাদেরও তো গলা দিয়ে রক্ত উঠবে। ছুটি চাইলে ছুটি পাওয়া যাবে না। কর্তাদের জানালে তক্ষুণি জবাব। মজুরের অসুখে এই হচ্ছে মালিকের দাওয়াই।

রোগ চেপে চেপে আজ একেবারে মরণদশা হয়েছে গোপালের। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। হাতে একটা পয়সা নেই যে ডাক্তার ডাকবে। এমনিতেই সংসার অচল হয়ে পড়েছে। আঁতপুর ইঙ্গুলের সেরা ছাত্র ছিল নেপালের ভাই কেষ্ট। ইঙ্গুল ছাড়িয়ে তাকে মিলিটারিতে জান দিতে পাঠানো হয়েছে। একজনের জান গিয়ে যদি পাঁচজনের জান বাঁচে। কিন্তু সেও আর কদিন?

গোলকধার মতো জগন্দলের গলি। কোনখান দিয়ে কোথায় গেছে কিছুতেই ঠাহর পাওয়া যায় না।

মিস্ট্রি হরি চক্রন্তির ইট-খসা ভিটেটা পর্যন্ত বাঁধা পড়েছে। পয়সাওয়ালা লোক বলে চক্রন্তিদের এককালে নামডাক ছিল। অবস্থা আজ একেবারে পড়ে গেছে। নইলে কি শেষটায় লাজলজ্জা ঘূঢ়িয়ে কারখানায় কাজ নিতে হয়? ভাইয়ে ভাইয়ে কতই না বনিবনা ছিল আগে। আজ আর মুখ দেখাদেখি নেই। বাড়িতে পার্টিশন উঠেছে। মন ছোটো হয়ে গেছে অভাবে।

অ্যাংলো-ইত্তিয়া মিলে কাজ করত লছমী। কয়লার অভাবে কদিন ধরে কল বন্ধ। হাজারের ওপর মজুর বেকার হয়ে বসে আছে। কাজ না পেলে কেমন করে তারা বাঁচবে? লছমী সারাদিন রেললাইনে আর ইছাপুর ইয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে পোড়া কয়লা কুড়িয়েছে। সেই কয়লা ফেরি করে সন্তায় বেচে যা দু-চার আনা পয়সা পেয়েছে, লছমী তাই নিয়ে চোরাবাজারে চলেছে চাল কিনতে।

হীরালাল বলে, ফুরোনের তাঁতিরা সুতো পায় না। পাবে কেমন করে? সব মিলেই স্পিনারের বেজায় অভাব। অন্য সব কারখানায় তারা বেশি মাইনের কাজ পাচ্ছে। কোন সুখে চটকলে থাকবে?

ডবল খাঁটুনিতে মজুরির হার কমেছে। কোনো কোনো কলে মিস্ট্রি আর তেলওয়ালাদের মজুরি টাকায় পাঁচ আনা অব্দি ছাঁটাই হয়েছে। মাকু ভাঙলে, বেল্ট ছিঁড়লে কোম্পানি বদলে দেয় না। কাজেই তাঁতিরা নিজেদের গরজে গাঁটের টাকা ভেঙে খেসারত দেয়। ঘৃষ না দিলে সর্দার আর বাবুরা এক পা নড়বে না। যেমন কাজ তেমনি রেট ঘুষের। তিন মাসের বদলি কাজ পেতে হলে ঘৃষ দিতে হবে কম করে দশ টাকা।

এদিকে কিস্তিবন্দি সুদের জন্যে কাবলিওয়ালা আজকাল দু-বেলা শাসিয়ে যায় সিদ্ধিক মির্ণাকে। বেচারার সাতখানা র্যাশন কার্ডের মধ্যে তিনখানা কার্ড টাকার অভাবে আমনি পড়ে আছে।

না খেয়ে উজাড় হচ্ছে চটকলের সাড়ে তিন লক্ষ মজুর। বছরে কোটি কোটি টাকার মুনাফা লুটছে চটকলের সাহেব আর দেশি মালিক।

গাঁ থেকে বেশি দিন হলো আসেনি পার্বতীয়া। গোড়ায় গোড়ায় লাইনে এত লোকের মধ্যে বড় বাধো বাধো ঠেকত তার। আস্তে আস্তে সবকিছু গা-সওয়া হয়ে গেল। কারখানার কাজে বেরোল পার্বতীয়া। না হলে সংসার চলে না। পেটে যদি থেতে না পায়, ইজ্জত ধূয়ে জল খাবে? কারখানায় জুলুম আছে অনেক। খাটায় বেশি, পয়সা দেয় কম। তার ওপর হজম করতে হয় সর্দার আর বাবুদের চড়-লাথি।

পার্বতীয়ার মুশকিল তার ছোটো ছেলেটাকে নিয়ে। ডবল শিফটে ঘরে ছেলে ককিয়ে মরে গেলেও দেখার কেউ নেই। ছেলেকে দুধ খাওয়াতে কারখানায় পাঁচ মিনিটেরও ছুটি পাওয়া যায় না। তাই যাবার সময় ছেলেটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্যে ছোট্ট ছেলেটার মুখে আফিং গুঁজে দিয়ে যায় পার্বতীয়া। আফিং খেয়ে মড়ার মতো পড়ে থাকে দুধের বাচ্চা।

রাস্তায় আগে যে বয়সের ছেলেরা সব খেলা করত, চাকা চালাত—সেই বয়সের ছেলেরা কেউ মিলিটারিতে বয় হয়েছে কিংবা ফুকানলিতে কাজ নিয়েছে। পাড়ার ইস্কুল পাঠশালায় মজুরদের পড়ুয়া ছেলে নেই বললেই চলে।

খয়রাতি ওযুধখানায় নবীয়ান বিবির দেড় বছরের মরো-মরো ছেলেকে দেখে ডাক্তার ঠোট উলটিয়ে বলে—দুধের ছেলেকে রেশনের চাল গিলিয়েছ, এখন বাঁচাই কী করে!

ঘরে ঘরে একই অসুখ। একে তো পুষ্টিকর কোনো খাওয়া নেই, তার ওপর কাঁকরভরতি পচা রেশনের চাল।

দাওয়াইখানার সামনে হাতে শিশি নিয়ে হইহল্লা করে মজুরের দল। তারা চটে গিয়ে বলে: একটো ঢাকোসলা ঠারা করকে রাখা হ্যায়। কুছুভি দাওয়া নেহি মিলতা, মিলতা শ্রিফ পানি। লক্ষ্মীচাঁদ, নাথুনী, বিকাউ, সামরথী, আবদুল গনি, শ্যামা, মুরারি—সকলেরই সেই একই ইতিহাস। কারো যক্ষা, কারো কুষ্ঠ। কারো ঘর ভেঙেছে, কারো ঘর ভাঙছে। তাদের কুন্দ আক্রোশ চিমনির মুখে ধোঁয়ার মতো উঁচিয়ে ওঠে।

রাত্তিরে গরমের চোটে আর মশার কামড়ে যেদিন ঘুম আসে না, শুয়ে শুয়ে তারা গ্রামদেশের কথা ভাবে। বাপদাদার ভিটেটুকু ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়েছিল খুব। দেনার দায়ে জমি লিখিয়ে নিয়েছিল গাঁয়ের মহাজন। পেটের ধান্ধায় চলে আসতে হলো শেষে শহরে। কতই না লোভ দেখিয়েছিল ফাগু সর্দার। চটকলের চাকরিতে দু-হাতে টাকা। চোদ্দো বছর ধরে খালি পেটে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে তারা চটকলের চাকরিতে কী মজা। সারাজীবন কাজ করেও চাকরি পাকা হয় না এখানে।

অত্যাচারে অত্যাচারে ভেঁতা হয়ে গেছে মানুষগুলো। মাঝে মাঝে তারা আগুনের মতো দপ করে জুলে ওঠে, ফস করে নিভে যায়। বিহারি, বিলাসপুরি, বাঙালি, মাদ্রাজি, ওড়িয়া। সাহেব মালিকরা তাদের আলাদা আলাদা করে রাখে। তারা এক হলে সাহেবদের যে সর্বনাশ।

সাঁইতিরিশ সালে একবার ডুবতে বসেছিল চটকলের সাহেবরা। গঙ্গার দু-পার জুড়ে তিন মাসের জন্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সমস্ত চটকল। মজুররা এক হয়ে হাত গুটিয়ে নিয়ে জারি করেছিল হরতাল।

সেসব দিনের কথা ভুলে গেছে কি চটকলের মজুর?

ফিরতে রাত্তির হয়ে যায় অনেক। রাস্তা খাঁ খাঁ করছে। তাড়িখানা বন্ধ। তার সামনে অসংখ্য মাটির ভাঁড় মুখ উলটে পড়ে আছে। গালিতে গালিতে গোপনে জুয়োখেলা চলেছে। একদল মাতাল হল্লা করে লাইনে ফিরছে।

দ্যুমন্ত লাইন। মনে পড়ল মাস্টারমশাই, এরশাদ আর ইউনিয়ন অফিসের কথা। বস্তিতে বস্তিতে দুরে তারা ডেকে তুলছে আচ্ছন্ন মানুষগুলোকে। বাঁলার বুক থেকে ঠেলে সারিয়ে দেবে তারা অত্যাচারের সাদা জগদ্দল পাথর।





## চাটগাঁয়ের কবিওয়ালা

কথুরখিল থেকে কাদা ভেঙে গোমদঙ্গী চলেছি।

জায়গাটা অজ পাড়াগাঁ। রাস্তার দুপাশে জঙগলের জটলায় আকাশ আছে কি নেই টের পাওয়া যায় না। দু-পা গেলেই একটা এঁদো ডেবা, তার একগলা শ্যাওলা। শুকনো পাতা জলে ভিজে বাতাসে পাঁক পাঁক গন্ধ।

এমন যে অজ পাড়াগাঁ, সেখানেও একটা করে চায়ের দোকান। কাঁচি সিগারেটের ছেঁড়া খালি প্যাকেট রাস্তার এখানে-ওখানে ছড়ানো।

যুদ্ধের আগে এমন ছিল না। সেপাই-পল্টনে সারা চাটগাঁ যে ছেয়ে গিয়েছিল। কাঁচা রাস্তা পাকা করবার কাজ পেয়েছিল হাজার হাজার মেয়েপুরুষ। গাঁয়ে গাঁয়ে বসেছিল নানান জিনিসের দোকানপাট। যুদ্ধ খতম হবার পর অন্য সব দোকান উঠে গেল। কিন্তু থাকার মধ্যে থেকে গেল শুধু চায়ের দোকান। এ ক-বছরে চায়ের নেশা চায়িদেরও পেয়ে বসেছে।

কাঁধ-ভাঙ্গা কাচের গেলাসগুলোর গা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফেঁটা ফেঁটা ঘোলাটে জল। গুড়ের নাগরীর মুখে বসেছে বোলতাদের গোলটেবিল বৈঠক। দুধের কড়াইটায় লোভ লাগার মতো মোটা সরের ওপর ভনভন করছে একবীক মাছি। বাঁশের বাখারি জোড়া দিয়ে খদ্দেরদের বসবার উঁচু জায়গা। তবু চায়ের গেলাস মুখের একদম কাছে নিয়ে গেলেও নাকে এসে লাগে বাতাসের পাঁক পাঁক গন্ধ।

একটু এগিয়ে বাঁহাতে ছ্যাতলা-পড়া একটা সরু পায়ে-চলা রাস্তা। এই রাস্তার শেষে কবিয়াল রমেশ শীলের বাড়ি।

রমেশ শীলের নাম জানে না চাটগাঁয়ে এমন গাঁ নেই। রমেশ শীলের গান শুনতে শুনতে রাত যে কখন ভোর হয়ে যায়, কারো খেয়ালই থাকে না। কারো কারো ভাবের ঘোরে এমন হয় যে, জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে।

ঘরে চুকলে প্রথমেই চোখ পড়ে দেয়ালের দিকে। মেঝে থেকে কড়িকাঠ অবধি চারপাশের দেয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে লেখা অসংখ্য নাম আর সেই সঙ্গে নানা জায়গার ঠিকানা। গোটা গোটা অক্ষরে আঁকাৰ্বাঁকা করে লেখা। যারা লিখেছে, তারা যেন হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি আর ভালোবাসা উজাড় করে রেখে গেছে দেয়ালের গায়ে। আর দেয়ালটা যেন কবির কাছে দেশসুন্ধ মানুষের দেওয়া মানপত্র হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

এক মুখ হাসি নিয়ে ঘরে চুকলেন প্রাম্য কবি রমেশ শীল।

যা ভেবেছিলাম একটুও মিলল না। ভেবেছিলাম কবি যখন, তখন এত বড়ো লম্বা চুল হবে; মুখটা হবে খুব গন্তীর, ভাবুক ভাবুক; গায়ে থাকবে লম্বাহাতা পাঞ্চাবি; আর কথা বলবে ছন্দের টানে হেঁয়ালির মতন করে।

ওমা, এ যে নেহাত আটপৌরে সাধারণ মানুষ। গায়ে হাতকাটা ফতুয়া। সারা গায়ে বার্ধক্যের বলিরেখা। রোদুরে পোড়া তামাটে রং। অনেকখানি চওড়া কপাল। চুল উঠে যাওয়ার দরুন বোধহয় আরও বেশি চওড়া দেখায়। যাও বা চুল ছিল, এখন ধৰ্বধবে সাদা। হাসলে রমেশ শীলকে ঠিক দু-বছরের শিশুর মতো দেখায়।

ঘরের মেঝের একপাশে গাদা-করা শুকনো খড়। ঘরের দিকে তাকালে বেশ বোৰা যায় গরিব গেরস্থের সংসার। দারিদ্র্যকে চাপা দেবার কোনো চেষ্টা নেই।

মহা ফাঁপরে পড়লেন রমেশ শীল আমাদের দেখে। বিশেষ করে কলকাতার লোক। যত্নআন্তি না করলে ফিরে গিয়ে লোকের কাছে বলবে কী!

অনেক কষ্টে নিরস্ত করা গেল। এক কাপ চায়ের বেশি আর কিছু নয়—এই রফা হলো। পেতলের ঘটিতে করে চায়ের জল চাপিয়ে মেঝের ওপর উবু হয়ে তামাক সাজতে বসলেন রমেশ শীল।

বললাম কেমন করে গান বানাতে শিখলেন সেই গল্প আমাদের বলতে হবে।

টিকের আগনে ফুঁ দিতে দিতে গল্প শুরু করলেন রমেশ শীল—

সে কি আজকের কথা? তখন বয়েস হবে বছর বাইশ। গাছপালার শিকড় দিয়ে ঘা সারানোর ব্যাবসা করতেন বাবা। আমিও শুরু করেছিলাম সেই পৈতৃক ব্যাবসা। কিন্তু তাতে মন বসছিল না আমার। লোকের দুঃখকষ্ট আর নানান চিন্তা মাথার মধ্যে ভিড় করে আসত।

সেবার জগন্মাত্রী পুজো। সদরঘাটে কবিগানের আসর হবে খবর পেলাম। গাইবেন চিন্তাহরণ আর মোহনবাঁশি। দুজনেই সেকালের নামকরা কবি। গিয়ে দেখি আসরের চারপাশে লোকে লোকারণ্য। গান শুন্ন হয়ে গিয়েছে। একজন দেন চাপান, একজন কাটান। এক-একটা কলি শোনে আর লোকে হইহই করে ওঠে ফুর্তিতে। কখনও মাথা ঝাঁকানি দিয়ে, কখনও দাঁড়িয়ে উঠে বাহবা দেয়।

সেই রাত্তিরে গান শুনে কবি হবার শখ আমায় পেয়ে বসল। তারপর দিন নেই রাত নেই, শুয়ে বসে আমার কেবল এক চিন্তা—কেমন করে ছন্দ আর মিল দিয়ে মনের কথা হাজার হাজার মানুষের কাছে বলা যায়। রাস্তা দিয়ে হাঁচি আর মনে মনে কথার সঙ্গে কথা মেলাই—‘মনে’র সঙ্গে ‘সনে’, ‘ভবে’র সঙ্গে ‘রবে’। মিলের জন্যে সবসময় ছটফট করে মন।

এদেশে তখন সবেমাত্র রেলের লাইন বসেছে। গরিব চায়িবাসির জায়গাজমি কিনে নিচ্ছে বিদেশিরা এসে। নদীর দুধারে ফেঁপে উঠছে বিদেশিদের কারবার। সেই রাগে প্রথম আমি আস্ত গান বানাই। দু-চারজন সেই গান শুনে খুব তারিখ করল।

পরের বছর পুজোর সময় আবার সেই কবিয়ালদের জলসা বসেছে। গান গাইতে গাইতে গোড়াতেই চিন্তাহরণের গলা হঠাৎ ভেঙে গেল। মহা মুশকিল। চিন্তাহরণ না গাইলে আসর মাটি হয়ে যায়। বায়না করা গান; পালা পুরো করতে না পারলে বেচারিদের অনেক টাকা গুনোগার দিতে হবে। কিন্তু চিন্তাহরণের গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না—এখন উপায়?

এমন সময় আসরের একপাশ থেকে কয়েকজন মুসলমান এসে জোর করে আমাকে টেনে তুলল। বলল, আসর মাটি হয়ে যায় তুমি ওঠো।

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখি পা দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে। সভায় দাঁড়িয়ে কবিগান করতে হবে ভাবলেই বুক শুকিয়ে যায়। তার ওপর শহর-বাজার জায়গা।

মোহনবাঁশি এসে পিঠ চাপড়ে বললেন, মেরে-কেটে দাদা রাত দশটা বাজিয়ে দাও, নইলে বায়নার টাকাটা মাঠে মারা যায়।

কী আর করব। যা থাকে বরাতে বলে কপাল ঠুকে উঠে দাঁড়ালাম।

গানের গোড়াতেই মোহনবাঁশি এমন যা তা বলে গালাগালি দিতে লাগলেন যে, রাগে সর্বাঙ্গ জুলে উঠল। কথার তির দিয়ে মোক্ষম করে বিঁলাম মোহনবাঁশিকে। গায়ের জুলায় মুখে যেন আপনা-আপনি কথা জুটে যেতে লাগল। জমে উঠল আসর। আমারও সাহস বেড়ে গেল।

এদিকে রাত দশটা কাবার হয়ে পরদিন সকাল দশটা বেজে গেল। আসর আর ভাঙতে চায় না। মোহনবাঁশিকে দুর্যো দিতে লাগল আসরের লোক—এতটুকু একটা ছেলের কাছে হিমসিম খাচ্ছে মোহনবাঁশি?

কিছুতেই কেউ কাউকে হারাতে পারছে না। কিন্তু একটা রফা তো হোক। কাঁহাতক আর আসরে বসে থাকা যায়? লোকে চ্যাচাতে লাগল—যোটক দাও, যোটক দাও।

যোটক দিতে জানলে তো আমি যোটক দেবো? মোহনবাঁশিরও রোখ চেপেছে নাবালক ছেলের কাছে যোটক সে কিছুতেই দেবে না। লোকে তখন আর উপায় না দেখে নিজেরাই আসর ভেঙে দিয়ে যে যার বাড়ি চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—মোহনবাঁশির হার হয়েছে।

সেই থেকে আমার নাম লোকের মুখে মুখে ছাড়িয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে বায়না পেতে লাগলাম। শুরু করে দিলাম গানের ব্যাবসা।

—বলতে বলতে পুরোনো দিনগুলোর মধ্যে যেন রমেশ শীল হারিয়ে যান। জুলজুলে দুটো চোখ কোনদিকে তাকিয়ে আছে ঠিক বোঝা যায় না।

আমাদের দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে হুঁকোয় টান দিতে দিতে রমেশ শীল আবার শুরু করেন তাঁর জীবনকথা।

এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে গান গেয়ে কাটল কয়েক বছর। একদিন তিনি শুনলেন মাবভান্ডারের পিরের কথা। অবাক কাণ্ড! সেখানে নাকি গান দিয়ে সব উপাসনা হয়। চাটগাঁর নিজস্ব ভাষায় নিজস্ব সুবে গান হয় সেখানে।

পূর্ববাংলার লক্ষ ধর্মপ্রাণ মুসলমান বছরের একটা সময় সেখানে এসে জড়ো হয়। পিরকে দেখে মজে গেলেন রমেশ শীল। একটানা সাত বছর তিনি সেখানে গান গেয়ে কাটালেন।

আরও অনেক নামকরা কবিওয়ালা মাঝভাঙ্গারে গান গেয়েছেন, কিন্তু রমেশ শীলের মতো এত জনপ্রিয়তা আর কেউ পাননি। হাজার হাজার লোক তাঁর গান শুনে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, মূর্ছা গেছে। এখানে গান গাইবার জন্যে পুরাণ আর কোরাণের অনেক কিছু পড়তে শুনতে হয়েছিল তাঁকে। সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ, আশা-আকাঞ্চকাকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন ধর্মের জবানিতে। তাই পূর্ববাংলার সমস্ত মুসলমানের কাছে রমেশ শীলের আরেক নাম ‘মাঝভাঙ্গারের মাঝি’।

কিন্তু মাঝভাঙ্গারে মন টিকল না রমেশ শীলের। গাঁয়ের দুঃখী মানুষগুলো যে তাঁকে ডাকছে।

সমাজে নানা রকমের অন্যায় আর অবিচার চলেছে। লোকের মধ্যে রয়েছে নানা রকমের কুসংস্কার। তার বিরুদ্ধে একা মাথা তুলে দাঁড়ালেন রমেশ শীল। অন্ধ মানুষগুলো তাঁর গান শুনে চোখে দৃষ্টি পেল।

স্বদেশি আন্দোলনের চেতু গাঁয়ে এসে যখন লাগল, তখন মেতে উঠলেন গ্রাম্য কবি রমেশ শীল। ক্ষুদ্রিমের ফাঁসি, পটুয়াখালির সত্যাগ্রহ—এইসব নিয়ে তাঁর বাঁধা গান লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় লোকের দুঃখদুর্দশা নিয়ে তিনি গান বাঁধলেন। এখনও তার একটা কলি তাঁর মনে আছে

পাঁচ গজ ধূতি সাত টাকা  
দেহ টেকা হয়েছে কঠিন  
রমেশ কয়, আঁধারে মারি  
পাই না কেরোসিন।

তারপর সারা চাটগাঁ জুড়ে জুলে উঠল বন্দুক আর পিস্তলের আগুন। পুলিশের অত্যাচারে পুরো দু-বছর কবিগানের আসর বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তাতে গান থামেনি। সূর্য সেন আর কল্পনা দন্ত, পাহাড়তলী আর জালালাবাদ নিয়ে তৈরি হয়েছে গান। সে গান পুলিশের চোখ এড়িয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে।

তারপর জোয়ার যখন নেমে গেল, তখন দেখা গেল চারিদিকে পাঁক জেগে উঠেছে। কবিগান আবার শুরু হলো বটে, কিন্তু সে গানের মধ্যে শুধুই কুরুচি আর কথার কচকচি।

রমেশ শীল তখন জেলার বাইশজন কবিওয়ালাকে নিয়ে একটা দল গড়ে তুললেন। সবাইকে একসঙ্গে করে তিনি এই প্রতিভ্রজা নেওয়ালেন যে, কুরুচিপূর্ণ গান কেউ গাইবে না। যদি কেউ গায়, তাকে একঘরে করা হবে। হাতে হাতে তার ফল ফলল।

এর পর এল যুদ্ধ। ছারখার হতে লাগল চাটগাঁ। কবিওয়ালারা মহা ফাঁপরে পড়ল। পুরোনো গান আর লোকের মনে ধরছে না।

হুঁকেটা দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে এক মুখ হাসি নিয়ে রমেশ শীল বললেন:

‘মুনশিরহাটে হঠাতে একটি চেনা ছেলের সঙ্গে দেখা। হাতে তার একটা কাগজ। তার ওপর লেখা ‘জনযুদ্ধ’। ছেলেটি বলল—নিয়ে যান পরে পড়ে দেখবেন। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আগাগোড়া পড়লাম। দেশের কথা ঠিক এভাবে জানবার কখনও সুযোগ হয়নি। নতুনভাবে গান লিখতে মনে খুব উৎসাহ পেলাম। অনেকদিন ধরে ভেতরে ভেতরে কেমন যেন হাঁচর পাঁচর চলছিল। এতদিনে একটা রাস্তা পেয়ে গেলাম। ঠিক করলাম সারা

চাটগাঁয়ে এবার গান দিয়ে মানুষ জাগাব। তারপর গাঁয়ে গাঁয়ে নতুন গান নিয়ে গিরেছি। লোকেও যেন ঠিক এমনি গানের জন্যেই এতদিন ওত পেতে বসেছিল। আমাদের গান তারা লুফে নিল।’

বলতে বলতে উঠে বসেন রমেশ শীল। কুঁচকে যাওয়া চোখেমুখে তাঁর জোয়ান বয়সের উদ্দীপনা।

ইচ্ছে ছিল না। তবু উঠতে হলো। অনেকগুলো গ্রামে যেতে হবে।

বললাম, চাটগাঁ শহরে তো আসছেন আপনি। আবার আমাদের দেখা হবে।

লাস্বুরহাটে ঘুরে ঘুরে একদিন হাটের দর জেনে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ একজন এসে বলল—দেখা করবেন ফণী বড়ুয়ার সঙ্গে?

ফণী বড়ুয়া হচ্ছেন রমেশ শীলের সবচেয়ে প্রিয় সাকরেদ। ‘দেশ জুলে যায় দুর্ভিক্ষের আগুনে, তবুও দেশ জাগিল না কেনে’—তাঁর গানের এ দুটো কলি অনেককেই গুনগুন করতে শুনেছি।

হাটের মধ্যেই একটা ঘড়ি সারাবার দোকান। ঘরটা অন্ধকার। কেউ আছে কি নেই বোঝা মুশকিল। যেদিক থেকে ঠুক-ঠুক, ঠুক-ঠুক আওয়াজ আসছিল, সেই দিকে তাকিয়ে দেখলাম একটা লোক নীচু হয়ে হাতুড়ি ঠুকছে। মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, দেখলে বয়স অল্প বলেই মনে হয়।

সঙ্গে যিনি ছিলেন, তিনি আলাপ করিয়ে দিলেন—ইনিই ফণী বড়ুয়া।

মুখে সর্বদা একটা লাজুক ভাব। গায়ে হাত গুটানো শার্ট। দেহে কিংবা মনে কোথাও জড়তা নেই। চাঁছা-ছেলা কথা, কোনো ঘোরপ্যাংচ নেই। দেখেই ভালো লেগে যায় এমনি মানুষ।

একে হাটবার, তার ওপর খরিদ্দারের ভিড়। বেচারির ঘাড় তুলে কথা বলবার সময় নেই। কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু করে কথা হলো।

‘খুব ছেলেবেলাতেই আমার বাপ-মা মারা যান। ইঙ্গুলে পড়ার সুযোগ হয়নি। দিনগুলো কী কষ্টেই না কেটেছে। কিছুতেই কিছু ভালো লাগত না। ঠিক করলাম সংসার ছেড়ে সন্ধ্যাসী হব। অনেক দিন গিয়ে থাকলাম এক বৌদ্ধ মঠে। প্রথম প্রথম এত ভালো লাগত। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, ততই বুবাতে পারলাম—পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এই ধর্মের জগৎটা বাইরের জগৎ থেকে আলাদা নয়। গেরুয়ার নীচে এখানেও মুখ লুকিয়ে আছে হাজার হাজার হুজুরুকি। তাই গেরুয়াতেও বৈরাগ্য এল। আরাকান পেরিয়ে চলে গেলাম বর্মায়। সেখানেও বেশিদিন থাকতে পারলাম না। বাঁচার কোনো রাস্তা খুঁজে পেলাম না।

‘আবার ফিরে এলাম দেশে। এক ঘড়ির দোকানে শিখতে লাগলাম কাজ। ওইটুকু একটা বাঞ্ছর মধ্যে কত রকমের যে কলকবজা। দেখি আর আশ্চর্য হয়ে যাই। উড়ু উড়ু মন এতদিনে পায়ের নীচে মাটি পেয়ে গেল। সারাটা দিন চোখে মোটা কাচের ঠুলি লাগিয়ে কাজ করি আর রাত্তিরে এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে কবিগান শুনে বেড়াই।

‘দিনগুলো নেশার মতো কাটে। গুনগুনিয়ে গান করি আর ঘড়ির বাঞ্ছের মধ্যে আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখি। হঠাৎ একদিন নিজের মনের ভেতর থেকে গান বেরিয়ে এল। কী যে ভালো লাগল সেদিন। এমনি করে ক্রমে গান বাঁধতে শিখে গেলাম। দু-একটা আসরে গান গেয়ে কিছুটা নামও হলো।

‘গাঁয়ে গাঁয়ে গান গেয়ে বেড়াতে পারলে আর আমি কিছু চাই না। কিন্তু যেতে পারি কোথায়? ঘাড়ের ওপর বড়ো সংসার। গান গেয়ে যা রোজগার হয়, তাতে এ-বাজারে চলে না। তাই ইচ্ছে থাকলেও দোকানের কাজটা ছাড়তে পারি না। কাজটার ওপর মায়াও পড়ে গেছে।’

তারপর ঘাড়টা উঠিয়ে লাজুক লাজুক মুখের ভাব করে ফণী বড়ুয়া বললেন:

‘হেলেটাও হয়েছে এমন, আমাকে ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পারে না। দু-দিন চোখের আড়াল হয়ে থাকলে আমারও মন ছটফট করে।’

এমন সময় একদল খরিদার এসে ভিড় করে দাঁড়াল। জায়গা না দিলে তারা বসতে পায় না। কাজেই বিদায় নিয়ে উঠতে হলো।

ফিরে আসবার আগের দিন চাটগাঁ শহরে হিন্দু-মুসলমানের এখটা বড়ো জমায়েতের ব্যবস্থা হয়েছে। বক্তৃতার শেষে কবিগান। মূল গায়েন রমেশ শীল আর ফণী বড়ুয়া। গান শুনতে শহর ভেঙে লোক এসেছে।

চেয়ার-টেবিল নামিয়ে মঞ্চ খালি করে দেওয়া হলো। তার ওপর ফরাস বিছিয়ে বসল একদল দোহার; একপাশে বড়ো ঢোলক আর কাঁসরঘণ্টা।

বেজে উঠল ঢাক আর কাঁসর। বাজখাই গলায় ঢাকের দ্রাম-দ্রা-ম দ্রিম-দ্রাম-দ্রাম-দ্রিম আর তার মাঝখানে ঠাঁ-ই ঠাঁ-ই করে কাঁসরের সরু ক্যানকেনে আওয়াজ।

উঠলেন রমেশ শীল। ঢাক আর কাঁসর থেমে গেল। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব। দেখে চিনতেই পারি না। রমেশ শীলের এ যেন এক অন্য চেহারা। ঝোড়ো কাকের মতো সাদা চুলগুলো আলুথালু হয়ে হাওয়ায় উড়েছে। চোখ দুটো মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে। শরীরের রেখায় রেখায় যেন বিজলির চমক। দেখে কে বলবে বাষটি বছরের বুড়ো।

সাধারণ মানুষের ভূমিকায় নেমেছেন ফণী বড়ুয়া আর মজুতদার সেজেছেন রমেশ শীল। একটার পর একটা গান হচ্ছে। চাপান আর কাটান।

কিন্তু এ এক নতুন ধরনের কবির লড়াই। এর মধ্যে ব্যক্তিগত গালাগালি নেই, অর্থহীন কথা কাটাকাটি নেই—শুধু আছে দুটো আদর্শের মধ্যে ক্ষমাহীন সংগ্রাম।

চোখের পর্দায় ভেসে উঠছে একের পর এক ছবি। আরাকানের রাস্তায় ঘরমুখো লক্ষ লক্ষ প্রবাসীর রক্তাক্ত পায়ের মিছিল। রাঙামাটিতে বোমা পড়ে, বোমা পড়ে পতেঙ্গায়, বোমা পড়ে কাছারির পাহাড়ে। সোনার দরে ধান বিকোয়, ধানের দরে জান বিকোয়—শহরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গাঁয়ের মানুষ। রাস্তায় রাস্তায় জমে ওঠে মরা মানুষের হাড় আর মাথার খুলি। না খেতে পেয়ে হাত-পা ফুলে যায়, ঘা-পাঁচড়ায় দগদগ করে সারা শরীর। মনের মধ্যেও পচ ধরে।

এরপর গোটা হল জুড়ে একটি জিজ্ঞাসা গমগম করে ওঠে—চাটগাঁর মানুষ মরবে কি?

ঢাক আর কাঁসর জলদ সুরে বেজে উঠে তোলপাড় করে তোলে যারা শুনছে তাদের মন। গায়ের লোমগুলো সকলের খাড়া হয়ে ওঠে। মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে রক্তের জোয়ারে। হঠাত থেমে যায় বাজনা।

চড়া গলায় শপথের মতো হুংকার শোনা যায়—না, মরবে না। হলসুন্দ মানুষ ধনুকের ছিলার মতো উঠে দাঁড়ায়। না, মরবে না চট্টগ্রামের মানুষ। ভাই ভাই হাত মিলিয়ে তারা ভেঙে দেবে পরাধীনতার ষড়যন্ত্রকে। বজ্জের কানে তালা ধরিয়ে আওয়াজ উঠতে লাগল—হিন্দু মুসলিম এক হও।

শুকনো বারুদে আগুন লাগিয়ে গান শেষ হয়। কিন্তু সভা ভেঙেও ভাঙতে চায় না। হল আর মঞ্চ ভিড়ের চাপে এক হয়ে গেছে। তাকিয়ে দেখি সেই জনসমুদ্রে ডুবে গেছে রমেশ শীল আর ফণী বড়ুয়া। অনেক চেষ্টা করেও তাদের খুঁজে পেলাম না।



# মেঘের গায়ে জেলখানা

মেঘের গায়ে জেলখানা। বিশ্বাস হয় না? দেখে এসো বক্সায়।

হাওড়া থেকে ট্রেনে উঠলে তিন দিন তিন রাত্তিরের পথ। ঢিকোতে যাবে প্যাসেঞ্জার ট্রেন। থামবে সাহেবগঞ্জে। যেতে যেতে চোখে পড়বে সাঁওতাল পরগনার বেঁটেখাটো পাহাড়। বুবাতেই পারবে না কখন ছাড়িয়ে এসেছ বাংলাদেশ। সাহেবগঞ্জ থেকে ট্রেন বদলিয়ে সকরিগালি ঘাট। পারানির স্টিমারে সেখান থেকে মণিহারি ঘাট। চেউ দেখে ভক্তি হবে এমন গঙ্গা। রাত্তিরে স্টিমারের সার্চলাইটের আলোয় হঠাত দেখবে এক আশ্চর্য কাণ্ড। ওপারের উঁচু বাঁধের ওপর আলো পড়তেই একটা ধ্বনিবে সাদা লাইন ছব্বিঙ্গ হয়ে গেল—যতটুকু আলো, ঠিক ততটুকু জায়গা জুড়ে দেওয়ালির পোকার মতো ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে সাদা বক না বলাকা? সার্চলাইটের কড়া আলোয় ওরা ভেবেছে বুঝি সকাল হয়ে গেল। এমনি করে সারা রাস্তা পাখিদের ভুল বোঝাতে বোঝাতে স্টিমার গিয়ে ভিড়ল মণিহারি ঘাটে।

তল্পিতঙ্গা নিয়ে হুড়মুড়িয়ে আবার ট্রেনে ওঠা। পূর্ণিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে কখন দেখবে আবার বাংলাদেশে পৌঁছে গেছ। তুমি যেখানেই যাও বাংলাদেশ তোমাকে টেনে নেবে।

মেঠো রাস্তার ওপর দিয়ে কাতারে কাতারে চলেছে মানুষ। মাথায় রংবেরঙের পাগড়ি। গোরুর গাড়ির ছইয়ের ওপর লালনীল কাগজের নিশান। আকাশে ঠেলে উঠেছে চাকায়-তাড়ানো ধূলো। ছোট ছোট পিলে-মোটা ছেলেদের হাতে তালপাতার ভেঁপু। মেলা থেকে তারা ফিরছে, একটু এগোলেই তা বোঝা যায়। স্টেশনের কাছেই একটা মাঠে চনচনে রোদুরে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু ছাতি আর ছাতি। উবু হয়ে বসা আড়ালের মানুষগুলোকে দেখা গেল না। একটা কিছু তামাসা হচ্ছে সেখানে। চারপাশে তাঁবু পড়েছে। গমগম করছে সারা তল্লাট।

দিন গিয়ে রাত। রাত গিয়ে দিন। হিমালয়ের কোলের কাছে ঘেঁষে এল রাস্তা। বর্ষায় পাহাড়ের গা বেয়ে ঢল নামে, জলের তোড়ে ভেসে আসে বড়ো বড়ো পাথর আর নুড়ি। শীতকালে জল শুকিয়ে গেছে। ঢালু মাটিতে জেগে রয়েছে চিত্রবিচিত্র বড়ো বড়ো পাথর আর নুড়ি। স্টেশনগুলোর মজার মজার নাম। তিব্বতিদের দেওয়া। এককালে বাঘের উপদ্রব ছিল, নাম তাই বাঘডোগরা। হাতির অত্যাচার ছিল, তাই হাতিঘিয়া। শিকারের ভালো জায়গা, নাম নকসালবাড়ি।

মাঠের মধ্যে ছোট শহর শিলিগুড়ি। চারদিকে পাহাড়তলীর অরণ্য—তরাইয়ের গভীর জঙগল। তার মাথার ওপর টেউয়ের মতো ঢলে গেছে একটার পর একটা পাহাড়। শিলিগুড়ি পেরিয়ে একটু ঢান দিকে ঠিকরে গেল রাস্তাটা। সামনেই একটা লম্বা যেমন-তেমন কাজ-চালানো গোছের পুল। নীচে দিয়ে গেছে খরঞ্চোতা তিস্তা। লেপচারা বলে রংতু বা সিধা নদী। বড়ো বড়ো পাথর আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের গুড়ি খড়ের কুটোর মতো ভেসে চলেছে তার ক্ষুরধার জলে।

যেতে যেতে ছোট একটা নেহাঁ নগণ্য স্টেশনে গাছপালার ভেতর দিয়ে আকাশের কপালের কাছটায় সোনার টায়রার মতো ঝলমল করে উঠল কী ওটা? একদল চেঁচিয়ে উঠল—কাঞ্জনজঙ্ঘা। সকালের সোনালি রোদ্বুর এসে পড়েছে বরফে মোড়া পাহাড়ের চুড়োয়। সেদিকে তাকিয়ে চোখের পলক পড়তে চায় না। যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে করে সেই দৃশ্য।

গাড়ি এসে থামে রাজাভাতখাওয়ায়। স্টেশনের গায়ে চায়ের ছোট দোকান। বেঁটে বেঁটে কাচের গেলাস। গেলা যায় না এমন বিশ্রী চা। তারই দাম দু-আনা। বাইরের উটকো লোক। কাজেই দাঁও মেরে নেবে।

হঠাঁৎ দোকানদারের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখবে ঠোঁটে আলতার রং, কামানো মুখে পেন্টের দাগ আর চোখে টানা কাজল। চোখেমুখে রাত জাগার সুস্পষ্ট ছাপ। জিজেস করতে হবে না, সে নিজেই বলবে—কাল আমাদের এখানে থিয়েটার ছিল কি না। আমাকে আবার ধরেছিল ফিমেল পার্ট করবার জন্যে।

আ মরণ, এই হাড়গিলে চেহারায় আবার ফিমেল পার্ট! কিন্তু দু-মিনিটেই ভাব হয়ে যাবে লোকটার সঙ্গে। বাড়ি তার যশোরের কোনো একটা গাঁয়ে। দেশ ভাগ হবার পর হাঘরে হয়ে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে ঠেকেছে। ছোট জায়গা। হয় রেল, নয় চা আর কাঠের চালানি কারবারের সঙ্গে জড়নো এখানকার জীবন। খেলা নেই, সিনেমা নেই। মাঝে মাঝে মেরাপ বেঁধে শখের থিয়েটারে যা একটু-আধটু বৈচিত্র্য।

যতদূর চা বাগান, ততদূর পিচ-চালা মোটরের রাস্তা। সামনে বেঁয়ার মধ্যে দেখা যায় কালো কালো কবন্ধের মতো পাহাড়।

মিলিটারি মেজাজে হু হু শব্দে চলবে ট্রাক। মনে হবে এই বুঝি হুমড়ি খেয়ে পড়বে পাশের হাঁ করা গড়নো জমিতে।

যেতে যেতে দুপাশে চায়ের সবুজ পাতি। বেতের ঝুড়ি পিঠে বেঁধে কাজ করছে কুণিকামিনেরা। মুখের হাজার রকমের গড়ন। কেউ সাঁওতাল, কেউ ওরাঁও, কেউ কোচ, কেউ পলিয়া। পুরুষদের হাঁটুর নীচে কারো কাপড় নেই। কারো কারো খালি গায়ে শুধু একটা সরু নেংটি। পাতা দিয়ে ছাওয়া ছোট ছোট ঘর। কোনো রকমে মাথা গাঁজে থাকে। শুকনো শুকনো মুখ, সরু পাটকাঠির মতো শরীর।

মাঝে মাঝে সাহেবদের রংচঙ্গে বাংলো। সামনে কেয়ারি করা ফুলের বাগান। দেউড়িতে দাঁড়ানো বাক্সাকে তকতকে আনকোরা নতুন গাড়ি। হঠাঁৎ তোমার চেখ বড়ো বড়ো হয়ে যাবে—ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে আজও যায়নি?

ভাবতে ভাবতে জানতেই পারবে না কখন তুমি পার হয়ে এসেছ চা-বাগানের চৌহদ্দি। হঠাতে একটা ঝাঁকুনি খেয়ে রাস্তার দিকে চোখ পড়বে তোমার। পিচ নয়, খানাখন্দে ভরতি মাঠ ভাঙা রাস্তা। অসংখ্য ছোটো ছোটো কাঠের সাঁকো। কোনোদিকে পরোয়া নেই, তারই ওপর দিয়ে উধর্ঘাসে ছুটছে ট্রাক। ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে যাবে।

তারপর বলা নেই, কওয়া নেই হঠাতে তোমাকে ঢেকে দেবে ডুয়ার্সের বাঘ ডাকা অরণ্য। দুপাশে গভীর শালবন। গা-ছমছম করা নির্জন ছায়াচ্ছন্ন রাস্তা। এখানে চেঁচিয়ে মরে গেলেও কেউ জানবে না। যতদূর দৃষ্টি যায়—না মানুষ, না বসতি। জঙগল যেন ফুরোতে চায় না।

দূরে পাহাড়ের যে-মাথাটা দেখা যাচ্ছিল সেটা আর চোখে পড়ছে না। রাস্তার দিকে তাকাতেই দেখা গেল মাটি নয় আর। কেবল বড়ো বড়ো পাথর আর নুড়ি। সামনে গঞ্জারের পিঠের মতো কালো একটা দেয়াল। রাস্তাটা ক্রমেই ওপরের দিকে উঠছে। আর মোটরের ইঞ্জিনে কানে তালা ধরানো একটা প্রচণ্ড গেঁ গেঁ আওয়াজ ক্রমেই পঞ্চমে চড়ছে। একটু পরেই বোঝা গেল আমরা আর সমতলে নেই, পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছি।

খানিকটা ওঠার পর তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় এসে হঠাতে ইঞ্জিনটা একেবারে চুপ করে গেল। গাড়ি যাবে না আর। সামনে একটা কাঠের ফলকে লেখা : ‘সান্তালবাড়ি’। সামনে সশস্ত্র পুলিশের ফাঁড়ি। এখান থেকে বক্সা আরো দু-মাইল। চড়াই উজিয়ে যেতে হবে।

ততক্ষণে তোমাকে ছেঁকে ধরেছে ময়লা আলখাল্লা পরা একদল ভুটিয়া ছেলেমেয়ে। তোমার ভারী ভারী বাক্স বিছানাগুলো তারা বয়ে নিয়ে যাবে। তাদের চেহারার দিকে তাকালেই বুঝাবে অসন্তুষ্ট গরিব তারা। তিন-চার বছরের রোগাপটকা ছেলেমেয়েদের কাঁধে ক্যানেস্টারার টিন। তার মধ্যে করে তারা মহাজনদের সওদা বয়। সারা দিন মোট বয়ে যা পায় তাতে পেটের ক্ষিধেটাও ভালো করে মেটে না। হাড়-লিকলিকে শরীরের মধ্যে শুধু পায়ের ডিমগুলো যা একটু মোটা।

থাকে ওরা পাহাড়ের অনেকখানি উঁচুতে ছোটো ছোটো গাঁয়ে। খুব কষ্ট করে বেঁচে থাকতে হয়। গাঁগুলোতে লোকও তাই খুব কম। একটু সুযোগ পেলেই পুরুষেরা সব কাজ নিয়ে চলে যায় পুলিশ কিংবা পল্টনে। যারা পড়ে থাকে, তারা কেউ ছুতোর মিস্টি, কেউ কাঠুরিয়া, কেউ ঘরামি, কেউ মোট বওয়ার কাজ করে।

এবার এক পাহাড় ছেড়ে আর একটা পাহাড়ে উঠতে হবে। খানিকটা জঙগলের রাস্তা। পাহাড়ের একেকটা খাঁজের কাছে গিয়ে ঘুর রাস্তার আড়াআড়ি গেছে সোজা রাস্তা—চোরবাটো। উঠতে উঠতে হাঁফ ধরে যায়।

খানিকটা উঠে রাস্তার একটা বাঁক ঘুরতেই কানে আসবে বির বির শব্দ। একটানা নিস্তুর্ধতার পর হঠাতে চমকে যেতে হয়। দেখা না গেলেও কাছেই কোথাও বারনা আছে। এতক্ষণ একটা পাখির ডাক পর্যন্ত শোনা যায়নি।

বারনার জল যেখান দিয়ে গেছে, তার ওপর দিয়ে কাঠের একটা পুল। পুল পার হয়ে খানিকটা এগিয়েই দু-একটা কাঠের ঘর দেখা গেল। ডাকঘর, জলকল আর বনবিভাগের অফিস।

একটা ছোট খোলা মাঠের ঠিক আগে তেমাথায় এসে হারিয়ে গেল সেই রাস্তা। একটা রাস্তা উঠে গেল সামনে জয়স্তী পাহাড়ে, অন্য রাস্তাটা বাঁদিকে বেঁকে গেল ভুটান পাহাড়ের গা বেয়ে সোজা তিক্কতের দিকে। মাসখানেকে যাওয়া যায় লাসায়।

ডানদিকে কাঁটাতারে ঘেরা জেলখানার চৌহদ্দি। গেটের সামনে চৌকি দিচ্ছে বন্দুকধারী সেপাই।

হঠাতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দেখবে কুয়াশার মতো কালো পর্দায় সমস্ত দিক ঢেকে গেল। সামনের লোকটাকেও আর দেখা যাচ্ছে না। মুহূর্তে আবার সব পরিষ্কার। যেন কোনো যাদুকরের খেলা।

ও কিছু নয়, মেঘ। অনবরত আসছে আর যাচ্ছে। সেই মেঘের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বক্সার জেলখানা। সমুদ্রের পিঠের ওপর আধমাইল লম্বা একটা কাঠের পোল যদি সোজা করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তার মাথা বরাবর হবে এই জেলখানা।

কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে সবুজ ঘাস আর কাঁকরে মেশা ছোট্ট মাঠ। মাঝখানে মাঝখানে মাথা-উঁচু করা সাদা সাদা আখান্মা পাথর। বেড়ার পুবদিকে জয়স্তী পাহাড়ে যাবার রাস্তায় ছোট্ট একটা কাঠের পুল। তার নীচে দিয়ে গেছে একটা শুকনো বারনা।

জেলখানাটা পাহাড়ের তিনতলা সমান একটা হাঁটুর ওপর। মাঠের গা দিয়ে উঠেছে পাথরের সিঁড়ি। সিঁড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক তার মুখে বড়ো একটা লোহার ফটক। ছোট্ট একটা গেট খুলে যাবে, তার ভেতর দিয়ে মাথা বাঁচিয়ে হেঁট হয়ে ঢুকতে হবে। বাঁদিকে জেলের অফিস, সেপাইদের ব্যারাক, চুনোপুঁটিদের কোয়ার্টার।

তিন-তিনটে ফটক পেরিয়ে তবে জেলের অন্দরমহল। হঠাতে দেখবে তোমার সামনে আকাশ ছাড়া কিছু নেই। কাঁটাতারে বেঁধা হলেও তবু তো আকাশ। আকাশের আর এক কোণে দেখবে পাহাড়ের আর একটা হাঁটুর ওপর এক-একটা গাছ তার মরা ডাল নিয়ে দাঁড়িয়ে।

পাহাড়ের তিনটে খাঁজ। সারি সারি ঘর প্রত্যেকটা খাঁজে। পুরু পাথরের দেয়াল, রং করা কাঠের ছাদ। ছাদের কাছ-বরাবর গরাদ-আঁটা গোরুর চোখের মতো জানলা। ডবল দরজা—মোটা কাঠের আর পেটা লোহার। সামনে কাঁটাতারে ঘেরা ছোট্ট ছোট্ট উঠোন।

ভেতরে যত কাঁটাতার আছে, সমস্ত এক করলে লম্বায় কয়েক মাইল হবে। আঁকাবাঁকা অনেকগুলো রাস্তা। দিনের বেলায় আলো বোলানোর পোস্টগুলো দেখলে ঠিক মনে হবে ফাঁসির মঞ্চ। দেয়ালের বাইরে একশো হাত অন্তর উঁচু করে তৈরি সেন্ট্রি-বক্স। তার ওপরে দাঁড়িয়ে দিন নেই রাত নেই পাহারা দেয় বন্দুকধারী সেপাই। বক্সা বন্দিশিবির দেখতে অনেকটা হিটলার জামেনির কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের মতো।

জেলখানা না দেখলে দেশের একটা বড়ো দিক অদেখা থেকে যায়। আর জেল বলতেই মনে পড়ে আলিপুর, প্রেসিডেন্সি কিংবা দমদমের কথা। প্রথম যারা সাজা খাটে, তাদের জন্য আলিপুর-নিউ সেন্ট্রাল। যারা বাস্তুঘৃঘৃ, জেলের ভাষায় যাদের বলে বি ক্লাস—তাদের জেল প্রেসিডেন্সি।

প্রকাণ্ড একটা চাবির রিং গলায় ঝুলিয়ে একটা দাঁড়িওয়ালা সেপাই কেবলি চরকির মতো ঘুরছে—একবার এ-গেট খুলছে, একবার ও-গেট। রাম-দুই-তিন বলে লোক ঢোকাচ্ছে আর বার করে দিচ্ছে। পাছে ভুল হয় তাই দুবার তিনবার করে গুনছে। মানুষগুলো যেন তার কাছে অঙ্গের একেকটা চিহ্ন ছাড়া কিছু নয়।

ভেতরে ঢুকেই দেখবে দেয়ালের গায়ে ছাপার মতো হরফে লেখা অনেকগুলো পোস্টার। গির্জার সামনে যেমন মথি লিখিত সুসমাচার লেখা থাকে তেমনি। তাতে লেখা আছে, চুরি করা মহাপাপ।

ছোটো কক্ষে চোখ রাঙ্গিয়ে সাধুচরণ সেদিকে তাকায় আর হাসে। ছেলের নাম রাখার সময় সাধুচরণের বাপ কি ভাবতে পেরেছিল, তার ছেলেটা বড়ো হয়ে এমন করে নাম হাসাবে? গায়ে মাংস নেই সাধুচরণের। বছর পঞ্চাশ বয়েস। জয়নগরের কাছে এক অজ গাঁয়ে তার বাড়ি। ছেলেবেলায় বাপ-মা মরে যায়। আঝীয়দের বাড়িতে জায়গা হয়নি। পেটের জ্বালায় ছিঁকে চুরি শুরু করে। হাতেনাতে ধরা পড়ে জেল হয়। জেল থেকে বেরোয় পাকা সিঁধেল চোর হয়ে। তারপর থেকে কতবার যে জেলে এসেছে তার ইয়ন্তা নেই। মাঝে একবার

মন হয়েছিল ঘর-সংসার করার। চোরাই পয়সায় কিছু জায়গাজমি কিনেছিল। বিয়ে করেছিল, একটা ছোট ছেলেও আছে তার। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও তাকে ভালো থাকতে দেয়নি রোজ রাত্তিরে প্রহরে প্রহরে চৌকিদারের খবরদারি। যেখানে যা কিছু হোক থানায় সাধুচরণের ডাক পড়বে। মোটা বুলের গুঁতো খেয়েও রেহাই নেই, গাঁটের কড়িও বেশ কিছু খসাতে হবে। মিছিমিছি এই জ্বালাতন পোড়াতনের চেয়ে চুরি করে জেলের ভাত খাওয়াই ভালো মনে করেছে সে। তবে ছেলেটার জন্যে আজকাল বড় মন কেমন করে। তাছাড়া শুকনো পড়ে আছে অতটা জমি। ছেলের নাম তার বিশে। গাঁয়ের লোকে ঠাট্টা করে বলে—চোট্টা সাধুর ছেলে হবে নির্ধারিত বিশে ডাকাত।

ইয়ার্ডে ইয়ার্ডে ভাগ করা জেলখানা। সেপাই-করেদিরা ইয়ার্ডকে বলে খাতা। সাত খাতার নীচে কিলবিল করছে পঙ্গপাল। জেলের ভাষায় বলে, ছোকরা ফাইল। কেউ ছিঁকে চোর, কেউ পকেটমার। এরা সব সাধুচরণের অতীত, সাধুচুরণ এদের ভবিষ্যৎ। গা শিউরে উঠবে দেখলে। আধো আধো কথা বলবার, ইঙ্গুলে ভরতি হবার বয়স। মানুষ করতে পারলে যাদের কেউ হতো ইঞ্জিনিয়ার, কেউ মাস্টার, কেউ লেখক—তারা বড়ো হচ্ছে পকেট কটার জন্যে, নিরাহ মানুষের গলা কাটার জন্যে। অধিকাংশই অনাথ শিশু, শহরের ফুটপাথে মানুষ। পাঠশালায় নয়, গুন্ডার দলে এদের হাতেখড়ি।

এদের মধ্যে একজনের নাম মুস্তাফা। ছোট ফুটফুটে ছেলে, বছরদশেক বয়েস। দুনিয়ার কাউকে যেন কেয়ার করে না এমনি ভঙ্গি নিয়ে চলাফেরা করে। এন্টালির ওদিকে কোনো ইঙ্গুলে পড়ত। বাপ তার রাজমিস্ত্রির কাজ করত। হঠাৎ একদিন তিনতলা উঁচু বাঁশের ভারা থেকে পা পিছলে পড়ে মুস্তাফার বাপ মারা গেল। মাইনের অভাবে মুস্তাফার নাম কাটা গেল ইঙ্গুল থেকে। বিধবা মা, বড়ো সংসার, অনেকগুলো ছোটো ছোটো ভাইবোন। বস্তিতে থাকত এক পকেটমারের সর্দার। টাকার লোভ দেখিয়ে সে দলের খাতায় মুস্তাফার নাম লিখিয়ে নিল। এরই মধ্যে মুস্তাফা বারচারেক পকেট মেরে জেলে এসেছে। ‘ইঙ্গুলে যেতে ইচ্ছে করে না?’ জিজেস করলে বলে, ‘ইচ্ছে করলেই কি যাওয়া যায়?’

জেলখানা একটা আলাদা জগৎ। চোর-ভাকাত-খুনি-গাঁটকটা—এই নিয়ে উঁচু পাঁচিল তোলা এখানকার জীবন। আলো-হাতোয়ার সঙ্গে আড়ি। আজব এখানকার ভাষা—না বাংলা, না হিন্দি। তেমনি ছিরি এখানকার জীবনের। জানোয়ারের পালের মতো খোঁয়াড়ের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে বাঁচ। সূর্যদের পাঠে বসতেই সঙ্গে সঙ্গে লকআপ—ঘরে ঢুকিয়ে তালাবন্ধ। রাত ফরসা হবার সঙ্গে সঙ্গে খোঁয়াড় খুলবে। সার বেঁধে দাঁড়াতে হবে ফাইলে। গুনতি হবে, গুনতি মেলার তিন ঘণ্টা পড়বে। সেলাম বাজাতে হবে জেলার জমাদারকে। পান থেকে চুন খসলেই পিঠে ডান্ডা কিংবা লোহার নাল মারা বুটের লাথি।

এছাড়াও আছে কেসটেবিল। কারও নামে নালিশ হলেই ডাক পড়বে কেসটেবিলে। কথায় কথায় ডিপ্রিবন্ধ, মার্কাকটা, কম্বল খোলাই কিংবা মাড়ভাত। কয়েদি দুরস্ত করবার হাজার ব্যবস্থা। ছোট ছোট নির্জন কুঠুরিকে বলে ডিপ্রি। চারিদিক বন্ধ, কারো মুখ দেখা যাবে না। বন্ধ দরজার নীচে সরু ফাঁক দিয়ে ছুঁড়ে দেবে ঠাণ্ডা খাবারের সানকি। মাসের পর মাস এমনি করে থাকতে হবে। কিংবা পায়ে পরিয়ে দেবে ভারী লোহার বেড়ি। বছরে তিন মাস সাজা মাপ করার নিয়ম আছে—তাকে বলে মার্কা। কর্তাদের মন জোগাতে না পারলে মার্কা কাটা যাবে। কম্বল দিয়ে সর্বাঙ্গ মুড়িয়ে লাঠি পেটা করার নাম কম্বল-ধোলাই। জেলখানায় হামেশাই হয়।

ভেতরে চুকে মনে হবে যেন মধ্যযুগের একটা প্রকাণ্ড কারখানা। জেলের সব কাজ করানো হয় কয়েদিদের দিয়ে। শুধু জুতো সেলাই নয়, হাড়ি-মেথরের কাজ থেকে চক্রীপাঠ পর্যন্ত সবই। তাছাড়া আছে দড়িচাল্লি,

ধোবিচালি, ঘানিকর, মিস্ট্রিঘর, ছাপাখানা, গোয়ালঘর, তরকারি বাগান—এমনি হরেক রকম ডিপার্ট।

কেনা গোলামের মতো কয়েদির দল বিনা মজুরিতে উদয়াস্ত এখানে থাটে। একটু ফাঁক পেলেই কয়েদিরা সেপাইদের দিকে নলচে আড়াল করে বসে নেশা করতে, অন্য একদল বসে যায় তিন তাসে জুয়ো খেলতে। সবাই পারে না। যারা সর্দার গোছের, হাতে পয়সা আছে—জেল তাদের মুঠোয়। দুনিয়া টাকার বশ—এ তারা জানে। জানে বলেই তারা জেলে এসেও দল পাকায়, অন্য দলের লোককে ভাংচি দিয়ে দলে টানে।

কিন্তু অবাক কাণ্ড। জেলখানায় পয়সা? আইনে তো নেই! আইনে নেই বলেই টাকা রাখবার মজার কল করেছে তারা। তাছাড়া চোরের রাজত্বে যেখানে সেখানে টাকা রাখলেই বা থাকবে কেন? তাই নিজেদের গলার মধ্যে বানিয়ে নিয়েছে টাকা রাখার থলি। সেই থলির মধ্যে টাকা রেখে দিব্য তারা নিরাপদে থায় দায় ঘুমোয়।

গলার মধ্যে থলি বানাতে কষ্ট আছে। ভারী একটা সিসের বল অনেকদিন ধরে গলার টাকারার কাছে রেখে দিতে হবে। যতই দিন যাবে ততই মাংস ছাঁদা হয়ে সেটা বসে যেতে থাকবে। ভেতরটা দগদগে ঘা হয়ে যাবে। অসন্তুষ্ট যন্ত্রণা। কাছাকাছি কেউ দাঁড়াতে পারবে না এত দুর্গন্ধি। বছরখানেক কাঁচা অবস্থায় থাকবে ঘা। তারপর সেই সিসের বল তুলে নেওয়ার পর ঘা যখন শুকিয়ে গেল তখন তৈরি হল গলার থলি। তার মধ্যে অনায়াসে সোনা-গিনি লুকিয়ে রাখো। কারো সাধ্য নেই টের পায়।

এরা ছাড়াও জেলখানায় একদল অভিজাত শ্রেণির কয়েদি আছে। খাবার জিনিসে বিষ মিশিয়ে বিক্রি করেছে কেউ, কেউ করেছে নেট জাল কিংবা ব্যাংকের লাখ লাখ টাকা চুরি—দিব্য ভদ্রলোক সেজে তারা বুক টান করে ঘুরে বেড়ায়। কর্তামহল তাদের আপনি আজ্ঞে করে, সাধারণ চোর-ছ্যাচড়রা তাদের সমীহ করে চলে। বড়লোকের এবং বড়ো ঘরের ছেলে এরা। ট্রাম-বাসে পকেট মারেনি, ব্যাংকের টাকা চুরি করে হাজার হাজার গরিব বিধাবার সংসারকে এরা পথে বসিয়েছে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছুরি দেখিয়ে এরা কারো হাত থেকে টাকার থলি ছিনিয়ে নেয়ানি, খাবার জিনিসে বিষ মিশিয়ে দেকানে দোকানে সেই বিষ হাজার হাজার মানুষের হাতে বিলি করেছে। ছোটলোক নয় এরা। ইঙ্কুল-কলেজে পড়েছে। পেটেও টান পড়েনি কোনোদিন। এমন নরম মন যে রক্ত দেখলে মূর্ছা যায়। তাই হাজার মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েও, শত সহস্র ছাপোষা সংসারকে পথের ফকির করে দিয়েও জেলে গিয়ে তারা সুখে আছে। কেননা তাদের বড়ো ঘর, বনেদি বৎশ—তারা সুয়োরানির ছেলে। আর যারা পেটের জ্বালায় পথ চলতি লোকের পকেট মেরেছে কিংবা জমি হারিয়ে পাইক বরকন্দাজদের সঙ্গে লাঠালাঠি করেছে তাদের জন্যে অনন্ত নরকবাসের ব্যবস্থা। কেননা তারা গরিব, সাধারণ মানুষ—দুয়োরানির ছেলে। জেলখানায় অসহ্য লাগে অপরাধের তুলনায় শাস্তির এই হেরফের।

কিন্তু এদের কারো জন্যেই তৈরি হয়নি বক্সা বন্দিশিবির। এ হচ্ছে এক বিশেষ জেলখানা।

দু-যুগ আগে ইংরেজ প্রথম তৈরি করেছিল এই জেল তার পুরোনো কেল্লায়। ভুটানের কাছে লম্বা মেয়াদে ইজারা নেওয়া এই জায়গা। আরও ঘন জঙ্গল ছিল আগে। এখনও পাহাড়ের গায়ে শোনা যায় বাঘের ডাক। এখানকার মাটিতে ফণ তুলে ঘুরে বেড়ায় বিষধর সাপ। বায়ু দূষিত করা জঙ্গলের হাওয়া ডন-কুস্তি করা জোয়ান শরীরকেও কাঁপিয়ে দেয়। বরনার জলে পিকনিক করছে রোগের জীবাণু। কাছেপিঠে বাজার নেই। অগ্নিমূল্য সব জিনিস। বাড়াবাড়ি অসুখ হলে ওয়ুধ অভাবে, হাসপাতাল অভাবে অবধারিত মৃত্যু।

নিজের দেশকে যারা ভালোবাসে, তাদের আপন প্রিয়জনদের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে সেদিন দূর দেশাস্তরে বনবাস দেবার ব্যবস্থা করেছিল ইংরেজ সরকার। আকাশের বুক চিরে দিয়েছিল তারা কাঁটাতারে,

সেপাইদের হাতে লাঠির বদলে তুলে দিয়েছিল টোটাভরা বন্দুক।

আজ ইংরেজ নেই, তবু তার আগের ব্যবস্থাই বহাল আছে বঙ্গায়।

দেশকে ভালোবাসা ছাড়া কোনো অপরাধই যাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়নি, আজও তাদের স্থান বঙ্গায়। আজও অনেকে এখানে আছেন, দু-যুগ আগেও যাঁরা এখানে ছিলেন। আছেন বয়োবৃদ্ধ খাঁসাহেব আর নীরদ চুরুবতী, আছেন ভগিনীস্থ্য শিবশঙ্কর মিত্র। যাঁর জীবন বাংলার অর্ধশতাব্দীব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের অঞ্চিগর্ভ ইতিহাস, সেই সতীশ পাকড়াশীও এখানে।

আর আছে বাংলার শহর-থামের অগণিত মানুষের বিশ্বস্ত বহু প্রতিনিধি।

যারা দুরস্ত পৌঁছে দিয়েছে উজ্জ্বল সন্তাননার খবর, যারা নুয়ে পড়া ধানের শীষগুলোকে বর্ণার ফলকের মতো সাহসে টান করে দিয়েছে, চিমনির ধূমায়িত মুখে যারা তুলে দিয়েছে আগনের ভাষা—ভুটানের গায়ের পাহাড়ে তারা বন্দি।

বাংলার মানচিত্রে খুঁজে পেলেও সে দেশ বাংলা নয়। ইংরেজের ঘূঘু চরানো ভিটেয় নির্বাসিত হয়ে আছে ভবিষ্যতের আশায় উন্মুখ আমার বাংলা।



## হাত বাড়াও

শীতকালে শুধু পায়ের পাতাটুকু ডোবে এমন নদী তিস্তা। হেঁটে পার হবার সময় পেছনে যদি তাকাও দেখবে আকাশের পিঠে পিঠে রেখে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে প্রকাণ্ড এক দৈত্য। আসলে দৈত্য নয়, হিমালয় পাহাড়।

নদীগ্রামের এক অখ্যাত গাঁয়ে নোনা-লাগা তালগাছের বন পেরিয়ে আকাশের কোলের কাছে প্রথমে ছোট একটা ফেঁটা, তারপর আস্তে আস্তে তালগাছের মতো বড়ো হয়ে উঠল কী ওটা? আগস্তুক এক জাহাজের মাস্তুল। আর সামনের বালিয়াড়ি পেরিয়ে ধু ধু করে উঠল নীল সমুদ্র। বঙ্গোপসাগর।

এই আসমুদ্রহিমাচল আমার বাংলা—পর্বত যার প্রহরী, সমুদ্র যার পরিখা।

ফরিদপুরের গাড়ি আসতে তখনও অনেক দেরি। রাজবাড়ির বাজারে বসে আছি। পাতলা কুয়াশায় মোড়া পঞ্চাশের আকালের এক সকাল। একটু দূরে স্টেশনের রাস্তায় মিলিটারি ছাউনির পাশে একটা অন্তু জন্তু দেখলাম। আস্তে আস্তে চার পায়ে এগিয়ে আসছে। চেনা কোনো জন্তুর সঙ্গে তার মিল নেই। কুয়াশার মধ্যেও জুল জুল করছে তার দুটো চোখ। একা থাকলে ভয়ে মুর্ছা যেতাম। কেননা সেই চোখের দৃষ্টিতে এমন এক মায়া ছিল, যা বুকের রক্ত হিম করে দেয়।

আরও কাছে এগিয়ে এল সেই মূর্তি। রাস্তার ধুলো থেকে কী যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। তার জুলন্ত দুটো চোখ কুয়াশায় কী যেন খুঁজে খুঁজে ফিরছে। ঠিক মানুষের হাতের মতো তার সামনের দুটো থাবা। আঙুলগুলো যেন আগার দিকে একটু বেশি সরু। গায়ে একটুও লোম নেই। কোন জন্ম?

সামনাসামনি আসতেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অম্বতের পুত্র মানুষ। বারো-তেরো বছরের উলঙ্গে এক ছেলে। মাজা পড়ে গেছে। হাঁটতে পারে না। তাই জানোয়ারের মতো চার পায়ে চলে। বাজারের রাস্তায় খুঁটে খুঁটে খায় চাল আর ছোলা।

ছুটে পালিয়ে এলাম স্টেশনে। কিন্তু আজও সেই দুটো জুলন্ত চোখ আমাকে থেকে থেকে পাগল করে। দু-হাতে সোনা ছড়ানো নদীমালার দিকে তাকিয়ে তার নিশাস শুনি। সরু লিকলিকে আঙুল দিয়ে সেইসব খুনিদের সে শনাক্ত করছে—শহরে প্রামে বন্দরে গঞ্জে জীবনের গলায় যারা মৃত্যুর ফাঁস পরাচ্ছে, মাথা উঁচু করে বাঁচতে দিচ্ছে না যারা মানুষকে।

সেই দুটি জুলন্ত চোখ শান্তি চায়। বাংলার বুক জুড়ে সবুজ মাঠের সোনালি ফসলে, চাষির গোলাভরা ধানে ভরে উঠুক শান্তি। কারখানায় কারখানায় বন্ধনমুক্ত মানুষের আন্দোলিত বাহুতে বাহু মেলাক শান্তি। যুদ্ধ নয়, অনাহারে মৃত্যু নয় আর। কোটি কোটি বলিষ্ঠ হাতে এবার স্বাধীন সুখী জীবন, এবার শান্তি।

যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের ঘনায়মান অন্ধকারে দুটি জুলন্ত চোখ জেগে আসমুদ্রাহিমাচল এই বাংলায় পাহারা দিচ্ছে আর মাটি থেকে দুটো হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দু-পায়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে সে। তোমরাও হাত বাঢ়াও, তাকে সাহায্য করো।





পর্ব : দুই

প্রবন্ধ রচনা রীতি,  
নির্দেশিকা ও নমুনা



## প্রবন্ধ রচনারীতি প্রসঙ্গে

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নবপ্রবর্তিত পাঠ্ক্রম ও পাঠ্যসূচিতে প্রথাগত প্রবন্ধ রচনার দীর্ঘদিনের গতানুগতিক চর্চা থেকে সরে আসা হয়েছে। কেননা এই স্তরে শিক্ষার্থীর লেখা প্রবন্ধের মধ্যেই নিজস্ব চিন্তা, ভাষাগত দক্ষতা, ভাবনার স্বচ্ছতা বিশদে প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ থাকে। তাই প্রবন্ধ লেখার প্রচলিত কৌশলের সঙ্গে নতুন ভাবনা এবং আঙ্গিকের মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে। প্রবন্ধের যে চারটি ধরন রাখা হয়েছে, তারা পরম্পরার থেকে আলাদা কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই যুক্তি ও কল্পনা, ভাব ও ভাষা এবং অর্জিত জ্ঞান ও তা প্রকাশের সামর্থ্য পরীক্ষিত হবে। সাধারণত প্রবন্ধ লেখার প্রস্তুতি হিসেবে যে সমস্ত তথ্য শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করে আসে, সেই সমস্ত তথ্য সে প্রশ্নের মধ্যেই পাবে। শুধু প্রয়োজন হবে নিজের ভাষায় গুছিয়ে লেখার পরিকল্পনা ও দক্ষতা। মানস-মানচিত্র কিংবা তথ্য-সূত্র অনুসারী প্রবন্ধে বিষয়-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ভাব আর তথ্য যেমন দেওয়া থাকবে তেমনই বিতর্কের আদলে কোনো একটি বক্তব্যের পক্ষে বা বিপক্ষের মতটি সে প্রশ্নপত্রের মধ্যেই পাবে, শুধু প্রতিযুক্তি দিয়ে এর বিরুদ্ধ মতটিকে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আবার কোনো একটি বিষয়ের প্রস্তাবনা অংশটি পড়ে নিয়ে, বুঝে, সেই বিষয়টিকে সুস্পষ্ট আলোচনার মাধ্যমে সম্পূর্ণতা দান করতে হবে। প্রবন্ধের এই চর্চা যেহেতু অভিনব তাই এর বিভিন্ন ধরনের সুস্পষ্ট নির্দেশিকা ও নমুনা প্রয়োজনীয়। এই কথা মনে রেখেই নির্দিষ্ট চার ধরনের জন্য নির্দেশিকা এবং নমুনা দেওয়া হলো।

\* রচনা লেখার বিষয়টি এক লাইনে না দিয়ে একটি মানস-মানচিত্র এবং তথ্য সম্ভার দেওয়া হবে। পরীক্ষার্থীরা সেই মানচিত্র এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যবহার করে/অনুসরণে কম-বেশি ৪০০ শব্দের মধ্যে একটি প্রবন্ধ রচনা করবে।

এই ধরনের প্রবন্ধ লেখার আগে যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে—

- মানস-মানচিত্রে দেওয়া ভাবনা বা তথ্যসম্ভার কুমানুসারে ব্যবহার না করে নিজের স্বাধীনতা অনুসারে কাজে লাগানো যাবে।
- লেখার সময় বিষয় এবং তথ্য অনুসারে মৌলিক চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটাই বাঞ্ছনীয়।
- লেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মানস-মানচিত্রে দেওয়া নেই অথচ বিষয়-সংশ্লিষ্ট এমন কোনো নতুন ভাবনা বা তথ্য যেমন ব্যবহার করা যাবে, তেমনই কোনো তথ্য বা ভাবনা পুনরুক্তিমূলক হলে তা পরিহার করা যাবে।
- মানস-মানচিত্রে দেওয়া কোনো একটি ভাবনা বা তথ্য বিষয়ে নিজের মনে অস্পষ্টতা থাকলে সোটিকে ভুলভাবে ব্যবহার না করে, এড়িয়ে যাওয়াই সমীচীন।
- প্রবন্ধের শৈলী, সৌন্দর্য, নিজস্বতা এবং পরিগতিবোধ সবসময়েই বিশেষ গুণ বলে বিবেচিত হবে।
- নির্ধারিত শব্দসংখ্যার কথা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। এই নিয়ম ১০ শতাংশ শিথিলযোগ্য।

নমুনা :



সে অনেক ছোটোবেলার কথা। তখন প্রাইমারি স্কুলে পড়ি। কোনো কোনো দিন বাড়িতে টিফিন খেতে আসি। কোনো কোনো দিন বাড়ি থেকে টিফিন নিয়ে যাই। তবে সবচেয়ে মজা হয় যেদিন দু-এক টাকা বড়োদের কাছ থেকে জুটে যায়। সেদিন ইচ্ছেমতো কিনে খাওয়ার অবাধ আনন্দ! আজ রচনা লিখতে বসে এমনই একটা দিনের কথা প্রথমে মনে পড়ল। সাদা শার্ট আর ঢোলা খাঁকি হাফ প্যান্ট পরে স্কুলে চলেছি। মনটা টগবগ করে ফুটছে, কেননা প্যান্টের ডান পকেটে রয়েছে একটা লাল চকচকে দু টাকার নোট। বারবারই মনে হচ্ছে কখন টিফিন টাইম আসবে, ঝাল ছোলা কিংবা আলুকাবলি না কি বাদামচাক! এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে জোরে পা ফেলে এগোচ্ছ হঠাত দেখি স্কুলেরই একটা অচেনা ছেলে ছুটতে ছুটতে আসছে, হাতে ধরা দু টাকার নোট। ‘তোমার পকেট থেকে পড়ে গেছে, এই যে’—তৎক্ষণে আমার হাত চলে গেছে প্যান্টের পকেটে, টাকাটা ওখানে নেই; রয়েছে অচেনা রতনের হাতে। একই সঙ্গে হারানোর দৃঢ় আর পরমুহূর্তেই ফিরে পাওয়ার

আনন্দে আমি আত্মহারা, স্তর্খবাক। এই ঘটনাই, শুধু তো টাকা নয়, সেদিন থেকেই আমায় প্রাণের বন্ধু রতনকেও পাইয়ে দিয়েছিল। এরপর থেকে দুজনে মিলে পথে, ঘাটে, মাঠে, জঙগলে কতকিছু কুড়িয়ে বেড়িয়েছি, কুড়িয়ে পেয়েছি; তার সবকিছু আজ আর মনেও পড়ে না। তবে সেইসব স্যাতসেঁতে ডাকটিকিট, তামার এক পয়সা, সোনালি পালক, ক্ষয়া বল প্রভৃতি কুড়িয়ে পাওয়ার অদ্ভুত অসামান্য আনন্দ আজও বুকের মধ্যে ভিড় করে। বড়ো হতে হতে রতনের সঙ্গে সঙ্গে জিনিসগুলি হারিয়েছি কিন্তু সেই অপ্রত্যাশিত আনন্দের রেশ স্মৃতিতে একইরকম রয়ে গেছে। এখনও রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় এদিক-ওদিক চোখ যায়। লোকলজ্জা আর ব্যস্ততার ভয়ে চাইলেও কোনোকিছু কুড়োতে পারি না। ছোটোদের কুড়োতে দেখে আনন্দ হয়। আর আমি নিজে হাতে কুড়িয়ে নিতে না পারলেও আমার মন টুকরো টুকরো কত ছবি কিংবা ঘটনা কুড়িয়ে নিয়ে জমা করে রাখে! শৈশবের সেই অভাবনীয় আনন্দের রেশ রয়ে গেছে বলেই তো এখনও মন যেন ঘরে-বাইরে কিছু একটা খোঁজে, কিছু একটা কুড়িয়ে পাওয়ার কথা ভাবে! রবীন্দ্রনাথের একটা গানের কথা মনে পড়ে—

‘হারিয়ে যাওয়া আলোর মাঝে কণা কণা কুড়িয়ে পেলেম যারে

রইল গাঁথা মোর জীবনের হারে।

সেই-যে আমার জোড়া-দেওয়া ছিন্ন দিনের খণ্ড আলোর মালা

সেই নিয়ে আজ সাজাই আমার থালা—’...

এর সবটা আমি বুঝি না। কিন্তু এটুকু মনে হয় যা অপ্রত্যাশিত তা প্রত্যাশিত নয় বলেই তো কদাচিত হাতের নাগালের মধ্যে ধরা দিয়ে হারিয়ে যাওয়ার আগে কখনো-কখনো চিরস্থায়ী ছাপ ফেলে যায়। একমাত্র মানবমনই জানে কুড়িয়ে পাওয়া কোনো ঘটনার স্মৃতি অনেক বছর পরেও আমার বন্ধু রতনের হাতের দোদুল্যমান দু-টাকা কিংবা ক্ষয়া কালো বল হয়ে ফিরে ফিরে আসে। জীবনের হারে গাঁথা স্মৃতিতে উজ্জ্বল মায়া হয়ে রয়ে যায়।

এই কুড়িয়ে পাওয়ার আনন্দ যে সন্ধ্যাসীর মনকেও আলোড়িত করে তা নিয়ে একটি সুন্দর গল্প বলেছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলি। এক বৌদ্ধ শ্রমণ শুনিয়েছিলেন রাস্তায় পয়সা কুড়িয়ে পাওয়াতে না কি খুব আনন্দ! এই কথা শুনে তাঁর মনে হলো একবার পরীক্ষা করেই দেখা যাক। তিনি ভিক্ষায় পাওয়া কয়েকটি পয়সা নিয়ে বারবার ছাড়িয়ে দেন এবং কুড়োন। কিন্তু তাঁর মনে কোনোরকম আনন্দ হয় না। তখন নিজের মনেই ভাবেন তবে সবাই যে বললে কুড়িয়ে পাওয়ায় ভারি মজা, তাঁরা তো কেউ ঠকানোর লোক নয়! এরপর ফের ছড়াতে এবং কুড়োতে শুরু করলেন। এইভাবে চলতে চলতে শেষটায় সবকটাই ঘাসের ভেতর পড়ে হারিয়ে গেল। এবার বহুক্ষণ ধরে খুঁজে যখন ফিরে পেলেন তখন চিৎকার করে উঠলেন এখন বুঝেছি। কিছু কুড়িয়ে পাওয়ায় অবশ্যই আনন্দ আছে।

\* কোনো একটি বিষয়ে কোনো একজন লেখকের লেখার একটি অংশ দেওয়া থাকবে। প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি হলো রচনার প্রস্তাবনা বা ভূমিকা। এই প্রস্তাবনা বা ভূমিকাটিকে অবলম্বন করে পরীক্ষার্থী বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করবে এবং পরিণতি দান করবে।

এই ধরনের প্রবন্ধ লেখার আগে যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে—

- প্রশ্নপত্রে প্রদত্ত অনুচ্ছেদটিকে মূল রচনার প্রস্তাবনা বা ভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করে পরিবর্তী অংশে সেই ভাবটিকে বিশ্লেষণ করতে হবে।
- প্রবন্ধ রচনার সময়ে মূল লেখাটি যে গ্রন্থের অন্তর্গত, তা পড়া না থাকলেও অসুবিধা নেই।
- প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যের সমর্থনে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি ও সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান ব্যবহার করা যাবে।
- প্রবন্ধের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যেন তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও রূপরেখাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
- সমাজ-সমস্যামূলক প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রতিকারের পথগুলি ও উল্লেখ করতে হবে।
- প্রবন্ধের শব্দসীমার প্রতি অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে।

নমুনা :

### পশ্চিমবঙ্গের হস্তশিল্প : কাঁসা-পিতলের কথা

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পচেতনায় হস্তশিল্পের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। হস্তশিল্পের সবচেয়ে বড়ো কথা হলো এই যে, তা কোনোদিনই বড়ো শিল্পের পরিপূরক নয়—তা আপন বিশেষত্বে সমুজ্জ্বল। হাতের ছোঁয়াই সেখানে বড়ো কথা—বড়ো কথা তার রং, নকশা ও সরোপরি শিল্পীর প্রতিভা। হস্তশিল্পই একমাত্র নির্দর্শন, যেখানে প্রতিভার সঙ্গে ধর্ম ও কলা বা আর্ট এবং শিল্প এক হয়ে গেছে।

বিশুপুর, খড়ার কী বহরমপুরের রাস্তায় যেতে যেতে কোনো একটা পাড়ার কাছে আসলেই আপনার কানে আসবে কাঁসার বাসন পেটানোর আওয়াজ। কলকাতার বড়োবাজারের একটি বড়ো পাটিতে দেখবেন শুধু পুরানো বাসনই কেনাবেচা হচ্ছে কত। এ শিল্পটি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আছে বহুদিন ধরে। কাঁসা-পিতল পশ্চিমবাংলার কুটিরশিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম বৃহৎ শিল্প।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নানান কুটিরশিল্প গড়ে উঠেছে, যাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ডোকরা শিল্প, গজদন্তশিল্প, পুতুলশিল্প, রেশম ও তসরশিল্প, মৃৎশিল্প, পটশিল্প, নকশি কাঁথশিল্প, শোলাশিল্প, ডাকের সাজ, শঙ্খচিল, মিষ্টান্নশিল্প, দারুশিল্প, দেশি বাদ্যশিল্প, ছবি-বাঁধাই, ফুলের গয়না তৈরি, ধোকড়া শিল্প, মুখোশ শিল্প, বাঁশের কাজ, কাঁসা ও পিতলের কাজ, কাঠ খোদাই, ফিলিথির কাজ, সুচের কাজ, মাদুর শিল্প, পুঁতিশিল্প, বিনুকের কাজ, বেতশিল্প, পাট ও মেখলির কাজ, বিড়ি শিল্প, সুতি ও পুঁতির গয়না (ম্যাক্রুম) শিল্প, চমশিল্প প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই কংসবণিকেরা বসবাস করে থাকেন। বহু মানুষ কাঁসা-পিতলের বংশানুক্রমিক ব্যাবসার মাধ্যমেই জীবনধারণ করেন। বাঁকুড়ার বিশুপুর; মুরশিদাবাদের খাগড়া; মেদিনীপুরের ঘাটাল, মনোহরপুর, আজুড়, খড়ার, মহিযাদল; বর্ধমানের বনপাশ, দাঁইহাট, বেগুনখোলা; হুগলির বাঁশবেড়িয়া, আরামবাগ; নদিয়ার মুড়োগাছ, মতিহারি, নবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে কলকাতার বাজারে কাঁসা-পিতলের বাসনপত্র এসে থাকে। কলকাতার কাঁসারিপাড়ায় চাদরের বাসন তৈরি হয়।

মুরশিদাবাদে নবাবি আমল থেকে নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত হয় হাতির দাঁতের কাজ, শোলা, বালাপোশ, কাঁসা-পিতলের কাজ। শিল্পীদের হাতের কাজ তাঁদের বুচি আর সৌন্দর্যবোধকে তৃপ্ত করত। এই নবাবি আমলেই কংসবণিক সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ মুরশিদাবাদের কান্দি আর খাগড়ায় বসতি স্থাপন করেন। খাগড়াই থালা, বাটি, প্লাস, কটকি থালা, গোলাপপাতা ডিশ, শঙ্খ পদ্ম ডিশ, চিরমারি বগি তৈরির পাশাপাশি ডিশের উপর বিভিন্ন মূর্তি গড়ে তোলার পারদর্শিতাও শিল্পীরা দেখিয়েছেন।

বীরভূম জেলাতেও কাঁসা-পিতলের কাজ অত্যন্ত প্রাচীন একটি শিল্প। এই জেলার চাকদহ, জয়দেব-কেন্দুলি, খয়রাশোল, নারায়ণপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এই শিল্পের বিস্তার লক্ষ করা যায়।

পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর ব্লকের তালাজুড়ি, মণিহারা, সুতাবই, রাউতাড়া, মানবাজার ১নং ব্লকের গোপালনগর, ভুতাম প্রভৃতি অঞ্চলে কাঁসা-পিতলের থালা, প্লাস, বাটি, কলশি প্রভৃতি তৈরি হয়। মালদার ইংলিশ বাজার, কলিথাম, কুতবপুরে কাঁসা-পিতল ও ভরণের জিনিসপত্র তৈরি হয়। বনেদি পরিবারে এখনও এদের কদর আছে। কাঁসা আর পিতল তৈরি হয় তামা, দস্তা আর টিন দিয়ে। কখনও বা এই কাজে অল্প পরিমাণ সিসে ব্যবহার করা হয়ে থাকে নির্মায়মান জিনিসটিকে নরম করার প্রয়োজনে। কাঁচামালের অধিকাংশ জিনিসই বিদেশ থেকে আনা হয়। কপার কর্পোরেশন গড়ে ওঠার পর থেকে এদেশেও কিছু পরিমাণ তামা শিল্পের প্রয়োজনে পাওয়া যায়। পুরানো, ভাঙা বাসনপত্র অল্প দামে বিক্রি হয়ে থাকে। কখনও তা গলিয়ে নিয়ে, আবার কখনও বা সম্পূর্ণ নতুনভাবে বাসন তৈরি করা হয়ে থাকে। অ্যালুমিনিয়াম আর স্টেইনলেস স্টিলের বাসনের রমরমার যুগে সাবেকি আমলের কাঁসা-পিতল ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। মানুষের মধ্যে কাচ, চিনেমাটির জিনিস ব্যবহারের প্রবণতায় কাঁসা-পিতলের ব্যবসা ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে। অতীত ঐতিহ্য ভুলে বংশানুক্রমিক ব্যাবসা ছেড়ে বাধ্য হয়ে ব্যবসায়ীরা অন্য ব্যাবসায় চলে যাচ্ছেন। পুঁজির অভাব, কাঁচামালের দামবৃদ্ধি, মানুষের বুচির পরিবর্তন ও চাহিদার হ্রাস, মহাজনি শোষণ, উন্নত প্রযুক্তির অভাব প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কাঁসা-পিতল শিল্পী-ব্যবসায়ীদের পিছনে ঠেলে দিচ্ছে।

অথচ, এমন একটা সময় ছিল, যখন নিম্নবিত্ত পরিবারে কাঁসা-পিতলের বাসনকে অস্থায়ী সম্পত্তির মতো মনে করা হতো। কারণ যে-কোনো সময়েই তার একটা নির্ভরযোগ্য বিক্রয়মূল্য ছিল। পূর্ববঙ্গেও ছিল

কাঁসা-পিতলের সমৃদ্ধ ব্যাবসা। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে বাসনের কদরও ছিল খুব। পশ্চিমবঙ্গেও কাঁসা-পিতলের ব্যাপক চল ছিল। এখনও বিহার, ওড়িশা, আসাম আর উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশে কাঁসা-পিতলের ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। বাংলাদেশে কাঁসা-পিতলের ব্যাবসা বহুদিনের। এর সঠিক সাল-তারিখ নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। কলকাতার বাজারেও একশো-দেড়শো বছরের পুরাণে কাঁসা-পিতলের কারবারিরা রয়েছেন। চন্দ্রকুমার, গেঁসাইদাস কুণ্ড, জীবনকৃষ্ণ কুণ্ড, জয়দেব, নিত্যলাল প্রামাণিক, শশিভূষণ, প্রভাপদ দে প্রমুখ বহুদিনের ব্যবসায়ী। এখনও বিয়ে, অন্নপ্রাশন, তত্ত্ব-তালাশ, প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ায় খাগড়াই বাসনের ঐতিহ্য রয়েছে।

কাঁসা-পিতলের ব্যাবসায় ভালো কারিগরের অভাব না থাকলেও উপযুক্ত শিক্ষা, বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের অভাবের কারণেই তাঁদের নাম কেউ জানেন না কিংবা কখনও তাঁদের নিয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়নি। তবু, নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই হারিয়ে যেতে-বসা শিল্পটিকে পুনরুদ্ধার করার প্রয়োজন রয়েছে। সরকার এই শিল্পকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। বাঁকুড়ায় খুচরো ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে রোলিং প্ল্যান্ট খোলা হয়েছে, কয়েকটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি গড়ে উঠেছে। সুবিধাজনক দামে কাঁচামাল সরবরাহ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। বাঁকুড়ায় একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সরকারি নিয়ন্ত্রণে এই শিল্পের বাজার তৈরি হলে শিল্পীরা অনেক বেশি সুবিধা পেতে পারেন। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবস্থা গৃহীত হলে শিল্পীরা আরও সুন্দর জিনিস গড়তে পারবেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজন গ্রামীণ ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক বা সরকারি ব্যাংক ঋণ ও আর্থিক সহায়তা, কাঁচামাল সরবরাহের সুবিধা তৈরি করা, বাইরে থেকে আমদানির সুযোগ বৃদ্ধি, দেশে ও বিদেশের প্রদর্শনীতে তৈরি জিনিস দেখানো ও বিক্রির ব্যবস্থা করা। মনে রাখতে হবে—

- (১) এই শিল্পের হাত ধরেই অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে—কেননা এই শিল্পে প্রচুর দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।
- (২) এটি একটি অল্প পুঁজিভিত্তিক কর্মেদ্যোগ।
- (৩) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গ্রামীণ অর্থনীতি এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে।
- (৪) এই শিল্প স্বনির্ভর কর্মসংস্থান সৃষ্টির সহায়ক।

দারিদ্র্যের চাপে যেন শিল্পীরা তাঁদের নৈপুণ্য হারিয়ে না ফেলেন, পূর্বপুরুষের স্মৃতিবিজড়িত ব্যাবসায় থাকা মানুষের যেন তাঁদের উৎসাহ বা উদ্যম না হারান, যেন কারিগরের অভাব এই শিল্পে কখনও না ঘটে। শুধু সরকারের উদ্যোগই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, গ্রাম-শহর নির্বিশেষে সকল মানুষকে এই প্রচেষ্টায় অংশ নিতে হবে।



\* বিতর্কের আদলে বিষয় এবং তার পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু যুক্তি দেওয়া থাকবে। পরীক্ষার্থীকে প্রতিপক্ষের যুক্তির অসারতা প্রমাণ করে স্বপক্ষের যুক্তিক্রম বিন্যাস করতে হবে।

- বিতর্কমূলক রচনায় যুক্তি-প্রতিযুক্তি সাজিয়ে মতের পক্ষে বা বিপক্ষে নিজের বক্তব্যকে অল্প কথায় লিখতে হবে।
- কোনো একটি নির্দিষ্ট মতের পক্ষে বা বিপক্ষেই কেবল যুক্তি সাজাতে হবে।
- প্রদত্ত অংশের বক্তব্যের বিরোধিতা করে, তার অসারতা স্পষ্ট করে নিজের মতটিকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বিনয় ও ঔদার্যের সঙ্গে কাজাটি করতে হবে।
- কখনই যেন রচনাটি ব্যক্তিগত আক্রমণের পর্যায়ে না যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।
- পরীক্ষার খাতায় নির্দিষ্ট বাক্যসংখ্যার মধ্যেই নিজ-নিজ যুক্তি সাজাতে হবে।
- আগেই বলা হয়েছে ব্যক্তিগত মতামত, ভাবাবেগ, বিশ্বাস বা সংস্কার নয়, যুক্তিই এক্ষেত্রে সর্বাপ্রগণ্য। তারই সঙ্গে বিন্যাসের পরিকল্পনা এবং প্রকাশের চমৎকারিত্ব বিতর্ককে করে তোলে স্বাদু ও মনোথাহী।

**নমুনা :**

**বিতর্কের বিষয় : ক্রিকেটের টি-টোয়েন্টি সংস্করণ খেলাটির মর্যাদা ও জনপ্রিয়তাকে ক্ষুণ্ণ করেছে।**

**মতের পক্ষে :**

টি-টোয়েন্টি মূলত ‘ধর তস্তা মার পেরেক’ গোত্রের খেলা। টেস্ট এমনকি পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচেও যেভাবে ধৈর্য, অধ্যবসায়, মনঃসংযোগ, ক্রিকেটীয় বুদ্ধি, শারীরিক সক্ষমতা এবং সর্বোপরি টেকনিকের পরীক্ষা হয়, তা যেন টি-টোয়েন্টিতে অনুপস্থিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্রীড়ানেপুণ্য নয়, বরং ভাগ্যের জোরেই খেলার ফল স্থির হচ্ছে। এর ফলে অধিকাংশ ব্যাটস্ম্যানও আর টেকনিকের দিকে নজর না দিয়ে মারকাটারি ব্যাটিং-এর দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। এর ফলে পিণ্ড হিটারদের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু প্রকৃত ব্যাটিং শিল্প অবলুপ্ত হচ্ছে। বোলিং-এর ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। মূলত ব্যাটস্ম্যানদের খেলা হওয়ায় বেশিরভাগ সময়েই বোলারদের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় কোনোমতে রান আটকানো, প্রয়োজনে নেগেটিভ বোলিং করেও। এইসব কারণেই যোগ্য টিম নয়, একটা ওভারের স্পেলে সমস্ত

হিসেবনিকেশ বদলে অযোগ্য টিমও অক্ষেশে জিতে যেতে পারে। এমনিতেই এখন ক্রিকেট-লিগের কারণে ক্রিকেটাররা কার্যত সারাবছরই খেলে চলেছেন। টাকার লোভে অতিরিক্ত ক্রিকেট স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের শারীরিক সক্ষমতায় থাবা বসাচ্ছে। অনেক ক্রিকেটার তো দেশের হয়ে ভালো খেলতে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হলেও আই পি এল বা অন্যত্র বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে নিয়মিত ভালো খেলছেন। এর কারণ নিশ্চয়ই লোভনীয় অর্থমূল্য। আর এই কোটি কোটি টাকার লেনদেনের কারণেই টি-টোয়েন্টি এবং প্রিমিয়ার লিগগুলি ধিরে তৈরি হয়েছে বেটিং, স্পট ফিল্ডিং প্রভৃতি ক্রিকেটজুয়ার বিভিন্ন অভিযোগ। আবার অন্যদিকে স্বচ্ছতা ও সত্যনির্ণয়ের হৃদযুদ্ধ দেখাতে যেভাবে টিভিতে খেলোয়াড়দের নিলাম করা দেখানো হয়, গোরু-ছাগলের মতো যেভাবে তাদের কেনাবেচা হয়—তাও নিতান্ত কুরুচিকর এবং আপত্তিজনক। খেলোয়াড়রাও দেশপ্রেম বা এইরকম কোনো বৃহৎ আদর্শ থেকে নয়, টাকা কামাতেই মাঠে নামছেন। টি-টোয়েন্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁদের চটজলদি অনেক টাকা উপার্জনের মূল মঝ। সব মিলিয়ে ক্রিকেটের ‘জেন্টলম্যানস্‌গেম’ বা ভদ্রলোকের খেলা বলে যে সুনাম ছিল তা ইতিপূর্বেই ধূল্যবণ্ণিত। এই কারণেই ক্রিকেটের জনপ্রিয়তাও তলানিতে এসে ঠেকেছে। অত্যধিক ক্রিকেট, বেটিং, খেলোয়াড়দের মান এবং মানসিকতার পরিবর্তন—এই সবই এর জন্য দায়ী। আগে যেভাবে ক্রিকেট ময়দানে ভারতের খেলা থাকলে আপামর ভারতবাসী সাধারে টিভির সামনে বসে থাকত, এখন তা দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। টি-টোয়েন্টি এবং তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন উপন্দবগুলি বন্ধ না করলে এই অনাগ্রহ আরও বাড়বে বহু কমবে না বলেই মনে হয়। হয়তো এমনও দিন আসবে যখন ক্রিকেট শব্দটা লেখা থাকবে কেবলমাত্র ইতিহাসের বইতে, আর এটাও থাকবে যে, খেলাটার কফিনে শেষ পেরেকটা পুঁতেছিল ওই খেলারই নবতম সংস্করণ—টি-টোয়েন্টি।

### মতের বিপক্ষে :

নতুন যে-কোনো কিছুর বিরুদ্ধেই সংরক্ষণকারীরা রে-রে করে ওঠেন, এটাই দস্তুর। যখন প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচ শুরু হয়েছিল, তখনও গৌঁড়ারা ক্রিকেট খেলার জাত গেল বলে প্রচুর চিংকার করেছিলেন। কালক্রমে কিন্তু টেস্টের জায়গায় ওয়ান ডে ম্যাচই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বস্তুত আজকের এই প্রচণ্ড দ্রুত গতির পৃথিবীতে পাঁচদিন ধরে টেস্ট, এমনকি গোটা দিন ধরে পঞ্চাশ ওভারের ওয়ান ডে ম্যাচ দেখার সময় বের করা দুঃসাধ্য। সময়ের দাবি মেনে ফুটবল, টেনিস, রাগবি বা অন্যান্য খেলার মতোই ক্রিকেটকেও হয়ে উঠতে হয়েছে সংক্ষিপ্ত এবং আরও উন্নেজক। তা না করে ক্রিকেটের অতীত গৌরব রোম্যান্স ও বেদনাবিলাসে খেলাটিরই অস্তিত্ব সংকট যে হতো না, কে বলতে পারে। তাছাড়া কেবলমাত্র

ଆଇ ମି ସି ସ୍ଵୀକୃତ କରେକଟି ମାତ୍ର ଦେଶେର ମଧ୍ୟେ ଖେଳା ନା ହୁଏ ଟି-ଟୋଯେନ୍ଟି ଯେ ପ୍ରିମିଆର ଲିଗେର ଜନ୍ମ ଦିଯେଛେ ତାଓ ଖୁବ ତାଂପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ଫୁଟ୍‌ବଲ ବା ଟେନିସେର ମତେଇ ବିଭିନ୍ନ ଲିଗ ଏବଂ କ୍ଲାବ ବା ଫ୍ର୍ୟାଞ୍ଚାଇଜିର କଲ୍ୟାଣେ କ୍ରିକେଟ୍‌ଓ ଅନେକ ଛଡ଼ାତେ ପାରଛେ । ଅନେକ ଦକ୍ଷ ଖେଳୋଯାଡ଼ ସୁଯୋଗ ପାଚେନ, ଦେଶେର ଜାର୍ସି ନା ପେଯେଓ ଅନେକେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଣ୍ଡେ ନିଜେଦେର ପ୍ରତିଭାକେ ମେଲେ ଧରାର ସୁବିଧେ ପାଚେନ । କ୍ଲାବେର କଲ୍ୟାଣେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶେର କ୍ରିକେଟାରରା ଏକସଙ୍ଗେ ଥାକଛେନ । ମତ ବିନିମୟ ଓ ବୋବାପଡ଼ା ବାଢ଼ିଛେ । ବିଶେଷତ ଶିକ୍ଷାଥୀ ଜୁନିଆରଦେର ଖୁବ ସୁବିଧେ ହଚ୍ଛେ ହାତେର କାହେଇ ଆଇକନଦେର ପେଯେ । ପିଣ୍ଡ ହିଟାରରା ନିଶ୍ଚଯାଇ ଆଛେନ, କିନ୍ତୁ ଏଟାଓ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ଟି-ଟୋଯେନ୍ଟିତେଓ ଶେଷ ଅବଧି କ୍ଲାସ ଆର ଟେକନିକଇ ଶୈସ କଥା । ଆନାଡ଼ି ଖେଳୋଯାଡ଼ ଦୁମଦାମ ବ୍ୟାଟ ଚାଲିଯେ ଏକବାର ଦୁବାର ରାନ ପେତେ ପାରେନ, ଧାରାବାହିକତାର ଜନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସାଧନାର କୋନୋ ବିକଳ୍ପ ନେଇ । କ୍ରିକେଟକେ ବଲା ହୁଏ ‘ମହାନ ଅନିଶ୍ଚୟତାର ଖେଳା’ । ଟି-ଟୋଯେନ୍ଟିର ଏକଟା ଓତାରେ ପରପର କରେକଟି ଓତାର ବାଟୁନ୍ଦାର ବା ଟୁଇକେଟ ଖେଳାର ରଂ-ଇ ନିମ୍ନେ ବଦଳେ ଦିତେ ପାରେ । ସେଇଦିକ ଥେକେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂକ୍ଷରଣେର ଥେକେଓ ଟି-ଟୋଯେନ୍ଟିଟି ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଉତ୍ତେଜକ ଓ ରୋମହର୍ଷକ ସନ୍ଦେହ ନେଇ । ଟେସ୍ଟ କ୍ରିକେଟେର ମତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ନା ହଲେଓ କ୍ରିକେଟିଆ ମଣ୍ଡିଷ୍ଠ, ଶାରୀରିକ ସକ୍ଷମତା ବା ଟେକନିକେର ଆବଶ୍ୟକତା ଟି-ଟୋଯେନ୍ଟିତେ କିନ୍ତୁ କମ ନଯ, ଟି-ଟୋଯେନ୍ଟିଟି ଦର୍ଶକକେ ଆବାର ମାଠେ ଫେରାଛେ । ଖେଳୋଯାଡ଼ଦେର ନିଳାମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳାତେଓ ହୁଏ । ବରଂ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମେ ଏର ସମ୍ପ୍ରଚାର ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଏବଂ ଭକ୍ତ-ସମର୍ଥକଦେର କାହୁ ଥେକେ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟୋଗ୍ୟତାଇ ବାଢ଼ିବେ । ବେଟିଂ ବା ସ୍ପଟ ଫିଙ୍ଗିଂ ଆଗେଓ କ୍ରିକେଟକେ କଳାଙ୍ଗିତ କରେଛେ, ଟି-ଟୋଯେନ୍ଟିକେଇ ଏକା ଦୌଁୟ ଭାବାର କୋନୋ କାରଣ ନେଇ । ଆର ପ୍ରଶାସକ ବା ଖେଳୋଯାଡ଼ରା ଜଡ଼ିତ ଥାକଲେଓ ତାଦେର ସଂଖ୍ୟା ମୁଣ୍ଡିମେଯ । କରେକଜନ ଖାରାପ ମାନୁଷେର ଜନ୍ୟ ଗୋଟା ଖେଳାଟାକେଇ କାଠଗଡ଼ାଯ ତୋଲାର କୋନୋ ମାନେ ହୁଏ ନା । ଆର କ୍ରିକେଟେର ଜନପିଯତା ବା ବିଶ୍ୱାସ୍ୟୋଗ୍ୟତା କମଲେ ଟି-ଟୋଯେନ୍ଟି ବିଶ୍ଵକାପ ବା ଆଇ ପି ଏଲ ଘରେ କୋଟି କୋଟି ଟାକାର ବିଜ୍ଞାପନୀ ସ୍ଵତ୍ତ ଓ ବ୍ୟାନ୍ଦ ଏନଡୋର୍ସମେନ୍ଟେର ବିଷୟଟା ଚଲତ ନା । ସ୍ପୋର୍ଟସ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଲିର ଟି ଆର ପି-ଓ ଅନେକ କମ ଥାକା ଉଚ୍ଚିତ ଛିଲ । ଆଶି-ନବରହିଯେର ଦଶକେ ମନୋରଞ୍ଜନେର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛିଲ ନା ବଲେଇ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକଭାବେ ହାଁ କରେ ଟିଭିତେ ଖେଳା ଦେଖିତ । ଆଜକେର ଯୁଗେ ଅଜ୍ଞ ଓ ବିଚିତ୍ର ବିନୋଦନେର ସୁଯୋଗେର ମଧ୍ୟେଓ ଲୋକେ କ୍ରିକେଟ ଦେଖିବେ ମୂଳତ ଟି-ଟୋଯେନ୍ଟିର ଆକର୍ଷଣେଇ । ଏକକଥାଯ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଟାକେ ବାଁଚିଯେ ରାଖିବେ ହଲେ ଶେଷ ଅବଧି ଏର ସଂକ୍ଷିପ୍ତର ସଂକ୍ଷରଣେର ଦିକେଇ ଜୋର ଦିତେ ହବେ । ଦୁନୀତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚଯାଇ କେଟେ ଯାବେ, ଉତ୍ତେଜନା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନେ ଭରପୁର ଟି-ଟୋଯେନ୍ଟିଟି ହୁଏ ଉଠିବେ କ୍ରିକେଟେର ଏକମାତ୍ର ସଞ୍ଚାର୍ଯ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ରୂପ ।

\* কোনো একটি বিষয়ে নানা ধরনের সূত্র ও তথ্য দেওয়া থাকবে। সেগুলিকে ব্যবহার করে পরীক্ষার্থী রচনাটি গড়ে তুলবে।

- প্রদত্ত তথ্যসূত্রগুলি ভালো করে পড়ে নিতে হবে।
- প্রবন্ধ রচনার স্বার্থে তথ্যগুলি কীভাবে সাজিয়ে নিলে ভালো হয়, তা ঠিক করে নিতে হবে।
- প্রয়োজনে অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন করা যেতে পারে।
- মৌলিক ভাবনা প্রকাশের পাশাপাশি রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিও ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বিষয় অনুসারে প্রবন্ধটির যথাযথ একটি শিরোনাম দিতে হবে।

নমুনা :

### উস্তাদ বিলায়েত খাঁ

- জন্ম : ২৮ আগস্ট ১৯২৮
- পিতামহ : উস্তাদ ইমদাদ খাঁ (সেতার ও সুরবাহার বাজাতেন; এর নামেই ঘরানার নাম ইমদাদ ঘরানা)
- পিতা : উস্তাদ এনায়েত খাঁ
- পিতার কাছে তালিম শুরু পাঁচ বছর বয়সে।
- আট বছর বয়সে ‘অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স’-এ প্রথম প্রকাশ্যে সেতারবাদন। এরপরেই পিতার মৃত্যু।
- কাকা ওয়াহিদ খাঁর কাছে তালিম।
- মায়ের পরামর্শে গায়ক হবার পথ ছেড়ে সেতারে মনোনিবেশ।
- ইমন, টোড়ি, শ্রী, দরবারি, ভৈরবী রাগ বাদনে বিশেষ খ্যাতি।
- সৃষ্টি করেছেন এনায়েতখানী কানাড়া, সাঁওস্বরাবলি, কলাবন্তী, মাঞ্চ ভৈরব।
- সংগীত পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়ের ‘জলসাঘর’, ইংরেজি ভাষায় ‘দ্য গুরু’ এবং মধুসূদন কুমারের হিন্দি ছবি ‘কাদম্বরী’। ‘জলসাঘর’-এর সংগীত পরিচালনার জন্য পেয়েছিলেন প্রথম মস্কো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের রৌপ্যপদক।

- উত্তরাধিকার : পুত্রদ্বয় সুজাত খাঁ ও হিদয়াত খাঁ, পণ্ডিত অরবিন্দ পারিথ, কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী রায়, বেঞ্জামিন গোমিন, লক্ষ্মী শেষগ, জিম সুলিভান।
- পেয়েছেন ১৯৬৪ সালে পদ্মশ্রী (প্রত্যাখ্যাত), ১৯৬৮ সালে পদ্মভূষণ (প্রত্যাখ্যাত), ২০০০ সালে পদ্মবিভূষণ (প্রত্যাখ্যাত), আফতাব-ই-সেতার ও ভারত সেতার সন্মান পুরস্কার।
- মৃত্যু : ১৩ মার্চ ২০০৪।

আমি একটা অঙ্গুত লিরিজিসম পাই ওর বাজনায়—একটা রোমান্টিক অ্যাপ্রোচ, একটা বয়্যাসি এবং ভিগার আছে। এই যে *combination of romanticism and buoyancy*, এটাই আসল জোর ওর বাজনায়! টেকনিক্যালিও অপূর্ব। তার কারণ এত পরিক্ষার ওর হাত, তানগুলো এত স্পষ্ট, তানের সঙ্গে মিডের যোগ করে যেটাকে ও ‘গায়কী অঙ্গ’ বলে প্রচার করে, তার এফেক্ট দারুণ সুন্দর হয়, বড়ো ভালো লাগে।...অত্যন্ত স্পষ্ট ঝালা। ...ওর সম্বন্ধে একটা কথাই বলতে পারি—ও খুব বড়ো আটিস্ট।

—পণ্ডিত রবিশংকর

## সেতার-সন্মান বিলায়েত খাঁ

ভারতের সংগীতজগতের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র উন্নত উন্নত বিলায়েত খাঁর সংগীতচর্চার মাধ্যম ছিল সেতার এবং সেতারে তিনি ছিলেন অবিসংবাদী সন্মান। পণ্ডিত রবিশংকর ছাড়া সেতারবাদনে বিলায়েতের তুলনা এ পৃথিবীতে নেই। আমাদের কাছে তিনি আরও গর্বের কারণ এই কলকাতাতেই তাঁর সংগীতজীবনের সূত্রপাত, বিকাশ ও পরিণতি।

বিলায়েত খাঁ সম্বন্ধে বলার আগে অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন তাঁর পিতা এনায়েত খাঁ এবং পিতামহ ইমদাদ খাঁ-র নাম। এই দুজনেই ছিলেন সেতার ও সুরবাহারে অত্যন্ত দক্ষ শিল্পী এবং এ কারণেই তাঁদের বাজনার ধরনকে ‘ইমদাদী ঘরানা’ বলে চিহ্নিত করা হয়। সংগীতে সমর্পিত এই পরিবারেই ১৯২৮ সালে ২৮ আগস্ট বিলায়েত খাঁর জন্ম। বাবার কাছে তালিম শুরু করেন বছর পাঁচেক বয়সে। মাত্র আট বছর বয়সেই ‘অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স’-এ প্রথম প্রকাশ্যে সেতার বাজান এবং সংগীতরসিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। কিন্তু তারপরেই মারা যান তাঁর পিতা এনায়েত খাঁ। এনায়েত খাঁর অনুপস্থিতিতে কাকা ওয়াহিদ খাঁর তত্ত্বাবধানে রেওয়াজ চলতে থাকে। বিলায়েত খাঁর সংগীতজীবনে তাঁর মায়ের প্রভাবও অত্যন্ত গভীর, মূলত তাঁর পরামর্শেই গায়ক হওয়ার পথ থেকে সরে এসে বিলায়েত সেতারে মন দেন।

বিলায়েত খাঁ মারা গেছেন ৭৫ বছর বয়সে, ২০০৪ সালের ১৩ মার্চ। ৮ বছর থেকে ৭৫ বছর—এই দীর্ঘ ৬৭ বছরের সেতার-জীবনে তিনি রেখে গেছেন একের পর এক মাইলস্টোন। তিনি ভারতীয় মার্গসংগীতের ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও রীতি ও ভাবনায় নতুনত্ব এনেছেন ইমন, টোড়ি, শ্রী, দরবারি ও ভৈরবী রাগের ক্ষেত্রে। বেশ কয়েকটি রাগ তিনি নিজে তৈরি করেছেন, যেগুলির মধ্যে এনায়েতখানী কানাড়া, সাঁঁবস্বরাবলি, কলাবন্তী, মাণ্ড ভৈরব উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্রের সংগীত-পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান মনে রাখার মতো। সত্যজিৎ রায়ের ‘জলসাঘর’, ইংরেজি ভাষায় ‘দ্য গুরু’ এবং মধুসূদন কুমারের হিন্দি ছবি ‘কাদম্বরী’—এই তিনটি সিনেমায় তাঁর সংগীতের প্রয়োগ অবিস্মরণীয়। ‘জলসাঘর’-এর সংগীত পরিচালনার জন্য পেয়েছিলেন প্রথম মঙ্গো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভালের রৌপ্য পদক।

উস্তাদ বিলায়েত খাঁর সেতার বাদন সম্পর্কে পণ্ডিত রবিশঙ্কর বলেছিলেন, ‘আমি একটা অস্তুত লিরিসিজম পাই ওর বাজনায়—একটা রোমান্টিক অ্যাপ্রোচ, একটা বয়্যালি এবং ভিগার আছে। এই যে combination of romanticism and buoyancy, এটাই আসল জোর ওর বাজনায়! টেক্নিক্যালিও অপূর্ব। তার কারণ এত পরিষ্কার ওর হাত, তানগুলো এত স্পষ্ট, তানের সঙ্গে মিডের যোগ করে যোটাকে ও ‘গায়কী অঙ্গ’ বলে প্রচার করে, তার এফেক্ট দারুণ সুন্দর হয়, বড়ো ভালো লাগে।...অত্যন্ত স্পষ্ট ঝালা। ...ওর সম্বন্ধে একটা কথাই বলতে পারি—ও খুব বড়ো আর্টিস্ট।’ এই ‘গায়কী অঙ্গ’ অর্থাৎ বিভিন্ন গায়ন পদ্ধতি যেমন খেয়াল, ঠুমরি ইত্যাদি চলনকে সেতারে নিয়ে আসার মধ্যেই বিলায়েত খাঁর বাজনার বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে আছে।

বিলায়েত খাঁর বাজনার ধারা আজও বহমান তাঁর দুই পুত্র উস্তাদ সুজাত খাঁ ও হিদ্যাত খাঁর মধ্যে দিয়ে। পুত্ররা ছাড়াও তিনি তালিম দিয়েছেন উস্তাদ ইমরত খাঁ, পণ্ডিত অরবিন্দ পারিখ, কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী রায়, রেঞ্জামিন গোমিন, লক্ষ্মী শেসন, বিখ্যাত ইংরেজ সংগীতকার জিম সুলিভানকে।

ভারতের সংগীতজগতের এই মহান স্বষ্টির খ্যাতি ও সাফল্যের পাশাপাশি বিতর্কও একটা বড়ো জায়গা জুড়ে আছে। ১৯৬৪ সালে ‘পদ্মশ্রী’ ও ১৯৬৮ সালে ‘পদ্মভূষণ’ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ তিনি মনে করেন যে তাঁর সংগীতকে বোঝার মতো কোনো ব্যক্তি এইসব কমিটিতে থাকে না। ২০০০ সালে ‘পদ্মবিভূষণ’ দেওয়া হলে তিনি তাও প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কারও ফিরিয়ে দেন। শুধু ‘আফতাব-ই-সেতার’(সেতারের সূর্য) এবং ‘ভারত সেতার সম্মান’ তিনি প্রহণ করেছিলেন। সংগীতজগতে রাজনীতি নিয়ে তিনি সারাজীবনই সোচ্চার ছিলেন।

ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে ২০০৪ সালে তিনি মারা যান। কিন্তু সারাজীবনের দীর্ঘ সাধনা তাঁকে সংগীতজগতের এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের আসন দিয়েছে। সেতার হাতে তিনি যেন সত্যিই ভারত-সম্মাট।





কবি, লেখক, নাট্যকার পরিচিতি

**অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৮৩):** জন্ম ১৯৩৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। সাবেক মানভূম জেলা, এখন বর্ধমানের রোপোগ্রামে। বাবা ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মা লক্ষ্মীরানী বন্দ্যোপাধ্যায়। কুলটি হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে আই এস সি এবং কলকাতার মহারাজা মণীনন্দচন্দ্র কলেজ থেকে বিএ। পরে ইংরেজিতে স্পেশাল অনার্স পাশ। শিক্ষকতা করেছেন প্রথম দমদমের মতিলাল বিদ্যায়তনে এবং পরে বাগুইহাটির ছিন্দু বিদ্যাপীঠে। ছাত্রজীবন থেকে অজিতেশ নাটক রচনা ও অভিনয়ে আগ্রহী। ১৯৫৪ সালে লিখেছেন মৌলিক পূর্ণঙ্গ নাটক ‘সংঘাত’। ১৯৫৬ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগ দেন। ১৯৬০-এর ২৯ জুন প্রতিষ্ঠা করেন ‘নান্দীকার’। এই নাট্যদলের ৩৪টি নাটকে অজিতেশ বৃপ্তান্ত/নির্দেশনা/অভিনয়সূত্রে যুক্ত ছিলেন। নাটকগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রযোজনা অবিস্মরণীয়। যেমন, ‘সেতুবন্ধন’, ‘চার অধ্যায়’, ‘নাট্যকারের সম্মানে ছাঁচি চরিত্র’, ‘নানারঙ্গের দিন’, ‘মঞ্জুরী আমের মঞ্জুরী’, ‘যখন একা’, ‘শের আফগান’, ‘তিন পয়সার পালা’, ‘নটী বিনোদিনী’, ‘ভালোমানুষ’, ‘আস্তিগোনে’, ‘সওদাগরের নৌকা’ ইত্যাদি। ১৯৭৭ ‘নান্দীমুখ’ নামে নতুন নাট্যগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন। এদের বিখ্যাত প্রযোজনা তলস্তয়ের পাওয়ার অফ ডার্কনেস অবলম্বনে বৃপ্তান্তিত নাটক ‘পাপপুণ্য’। পেশাদারি মধ্যে অজিতেশ ‘থানা থেকে আসছি’, ‘বাঘিনী’ ও ‘এই অরণে’ নাটকে অভিনয় করেছেন। বাংলা ও হিন্দি মিলে ৫০টিরও বেশি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। যেমন, ‘অতিথি’, ‘ছুটি’, ‘মহাবিলুবী অরবিন্দ’, ‘হাটেবাজারে’, সাগিনা মাহাত্মা’, ‘এক আধুরী কহানি’ ইত্যাদি। বেতারে ও দুরদর্শনে বহু নাটকের প্রযোজনা, নির্দেশনা ও অভিনয়ে ছিলেন অজিতেশ। যাত্রা করেছেন। সুর দিয়েছেন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৌলিক ও বৃপ্তান্তিত নাটকের সংখ্যা ২৬। এদের মধ্যে আছে ‘সওদাগরের নৌকা’, ‘মঞ্জুরী আমের মঞ্জুরী’, ‘ভালোমানুষ’, ‘পাপপুণ্য’, ‘সাঁওতাল বিদ্রোহ’, ‘মুদ্রারাক্ষস’। বাংলা নাটকে প্রতিষ্ঠা সমিতির প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয় বিশাখদত্তের ‘মুদ্রারাক্ষস’। নাটকের নির্দেশনা ও অভিনয়ে ছিলেন অজিতেশ। এই বিপুল ব্যস্ততার মধ্যেই তিনি লিখেছেন উপন্যাস ‘ভালো লেগেছিল’। বহু প্রবন্ধ ও ছোটোগল্প লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন কবিতা। অজিতেশ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছাড়াও মঙ্গো নিউজ ক্লাব ক্রিটিক সার্কল অব ইন্ডিয়া, দিশারী, রঞ্জসভা ইত্যাদি বহু সংস্থা কর্তৃক পুরস্কৃত হন। লাভ করেন সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার। ১৯৮০ সালের ১৪ অক্টোবর তিনি আকস্মিকভাবে প্রয়াত হন।

**কর্তার সিং দুগ্গাল (১৯১৭-২০১২):** জন্ম রাওয়ালপিণ্ডি জেলার ধমিয়ালে (বর্তমানে পাকিস্তান)। বাবা জীবন সিং দুগ্গাল, মা সতওয়ান্ত কউর। সাহোরের ফরম্যান ক্রিপ্চান কলেজ থেকে ইংরেজিতে এমএ। ১৯৪২-এ আকাশবাণীতে যোগ দেন। ‘আকাশবাণী’র অধিকর্তার পদ থেকে অবসর নেবার পর ‘ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট’-এর অধিকর্তা (১৯৬৬-৭৩) ছিলেন। যোজনা কর্মশৈলের উপদেষ্টা (১৯৭৩-৭৬) রূপেও কাজ করেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালের পাঞ্জাবি সাহিত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিক দুগ্গাল কবি হিসেবে লেখক-জীবন শুরু করেন। পরে কবিতা লেখা কমিয়ে দিয়ে গদ্দের দিকে মনোযোগ দেন। কবিতা, ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক, সাহিত্য-সমালোচনা—সাহিত্যের সব মাধ্যমেই তিনি লিখেছেন। মূলত মাতৃভাষা পাঞ্জাবিতে লেখার পর বহুভাষাবিদ লেখক সেগুলি নিজেই ছিন্দি, উর্দু আর ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। সাহিত্যিক হিসেবে কর্তার সিং দুগ্গালের প্রতিষ্ঠা সর্বভারতীয়। সাহিত্য অকাদেমি (১৯৬৫), গালিব পুরস্কার (১৯৭৬), সোভিয়েত ল্যান্ড নেহুর পুরস্কার (১৯৮১), ভাই বীর সিং পুরস্কার (১৯৮৯) ছাড়াও পেয়েছেন পদ্মভূষণ (১৯৮৮); তাঁর বেশ কিছু গল্প-উপন্যাস বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঞ্জাবি বিভাগে পাঠ্য। দুগ্গালের রচনা অনুদিত হয়েছে ভারতের প্রধান-প্রদান ভাষা ছাড়াও বেশি কিছু বিদেশি ভাষায়; বিশিষ্ট সাহিত্যিক হিসেবে অনেক দেশ অ্রমণ করেছেন।

রচনাবলির মধ্যে আছে দুটি কাব্যগ্রন্থ : কন্ধে কন্ধে (১৯৪১), বন্ধ দরওয়াজে (১৯৫৯)।

চরিশটি গল্প সংকলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : দঙ্গর (১৯৪৪), নাওয়ান ঘর (১৯৫১), পরে মেরে (১৯৬১), ইকছিট চাননদি (১৯৬৩), সোনার বাংলা (১৯৭৬), মিল পথের, মৌরিয়া শ্রেষ্ঠ কহানিয়া। দশটি উপন্যাসের মধ্যে

**উল্লেখযোগ্য :** হাল মুরিদাঁ দা (১৯৫৮), শরদ পুনম কি রাত (১৯৭৮)। সাতটি নাটকের বই এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : ইর সিকর সিকর, সত নাটক, পুরানিয়া বোতলা, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। এ ছাড়া এক খণ্ড আঘাজীবনী, সাহিত্য-সমালোচনামূলক সাতটি বই লিখেছেন।

**জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) :** জন্ম বরিশাল জেলা শহরে। পূর্বপুরুষের আদি নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার পদ্মাতীরের গাউগাড়া গ্রাম। বাবা সত্যানন্দ দাশ। মা কুসুমকুমারী দেবী। বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয় থেকে ১৯১৫-ঝ ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯১৭-ঝ বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই এ উন্নীর্ণ হন। দু বছর পর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স-সহ বি এ পাশ করেন। এ বছর ‘বৃঞ্জবাদী’ প্রতিকায় ‘বর্ষাআবাহন’ নামে তাঁর কবিতা ছাপা হয়। এই প্রকাশের মাধ্যমেই জীবনানন্দের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ। ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম এ পাশ করেন। ১৯২২ খি. কলকাতার সিটি কলেজে ইংরেজি বিভাগে ‘টিউটর’ পদে কর্মজীবন শুরু করে প্রায় তিরিশ বছর ধরে খুলনা-দিঙ্গি-বরিশাল-কলকাতার বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন কিন্তু কোথাও স্থায়ী হতে পারেনি। সারা জীবন জীবিকার, অনিশ্চয়তার দুসহ কষ্ট ভোগ করেছেন জীবনানন্দ দাশ। অবশ্যে হাওড়া গার্লস কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন ১৯৫৩ খি স্কুলে। বিভাগীয় প্রধানও হন। দুর্ভাগ্যের বিষয় কিছুদিন পরেই পথ দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয় (১৯৫৪)।

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি জীবনানন্দ দাশ জীবৎকালে বিতর্কিত হয়েছেন বারবার। উপেক্ষিত হয়েছেন। প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। তবু তিনি অবিরাম লিখে দিয়েছেন। সমন্ব্য করেছেন বাংলা সাহিত্যকে। তাঁর কাব্যগুলির মধ্যে ‘বারাপালক’, ‘ধূসর পাঞ্চলিপি’, ‘মহাপৃথিবী’, ‘সাতটি তারার তিমির’, ‘বনলতা সেন’, ‘রূপসী বাংলা’, ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’। গল্প-উপন্যাসও লিখেছেন বিস্তর। যেমন ‘নিরূপম যাত্রা’, ‘কারুবাসনা’, ‘জলপাইহাটি’, ‘প্রেতিনীর বৃক্ষকথা’ ইত্যাদি। কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধগুলির নাম ‘কবিতার কথা’। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে জীবনানন্দের ‘লিটোরারি গ্রেটস’।

**বের্টোল্ট ব্রেখ্ট (১৮৯৮-১৯৫৬) :** জার্মানির বাভারিয়ার আউগসবুর্গের এক সম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রেখ্টের বাবা ছিলেন স্থানীয় কাগজ কারখানার অধিকর্তা। একটি মেডিক্যাল স্কুলে কিছুদিন পড়াশোনা করেন ব্রেখ্ট। পরে একটি সামরিক হাসপাতালে কাজ পান। যুদ্ধ-ফেরত আহত সৈনিকদের সেবা করা ছিল তাঁর দায়িত্ব। ১৯২৪ খি স্কুলে ব্রেখ্ট ‘লাইফ অব এডওয়ার্ড টু অব ইংল্যান্ড’ নামে একটি নাটক লেখেন। বুশ বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়ে বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণি সম্পর্কে তাঁর চেতনার উন্মোচন ঘটেছিল। ১৯২৮ খি স্কুলে ‘দ্য পেনি অপেরা’ তাঁকে বিখ্যাত করে তোলে। নাটকের নায়ক ম্যাকিজুল ব্রেখ্টের ভাষায় ‘বুর্জোয়া ডাকাত’। ব্রেখ্টের মতে, পুঁজিবাদী সমাজের ‘মহান ও ইতিবাচক’ নায়কের তত্ত্বটি একটি বিরাট ধাপ্তা। পুঁজিবাদী সভ্যতায় মানুষ প্রকৃতি ও নিজের সত্তা থেকে বিয়োজিত হয়েছে। তাই ব্রেখ্টের নায়কেরা খর্বাকৃতি, ছোটোমাপের মানুষ। ১৯৩০ খি স্কুলে ব্রেখ্ট প্রবাদপ্রতিম অভিনেত্রী হেলেনে ভাইগেলকে বিবাহ করেন। ১৯৩৩ খি স্কুলের ফেব্রুয়ারিতে রাইখস্ট্যাগের অগ্নিকাণ্ডের পর জার্মানিতে নেমে এসেছিল মানব ইতিহাসের এক বর্ষরতম অধ্যায়। ব্রেখ্ট সপরিবার দেশত্যাগী হন। ডেনমার্ক, সুইডেন, ফিনল্যান্ড এবং অবশ্যে কালিফোর্নিয়া। প্রেপ্তার ও কারাদণ্ড এড়িয়ে ব্রেখ্ট দেশ থেকে দেশান্তরে পৌছেছেন। আর একের পর এক সৃষ্টি করে গেছেন তাঁর কালজয়ী নাটকগুলি। ‘মাদার কারেজ’, ‘গ্যালিলিও’, ‘চক সার্কল’, ‘ডি টাগে’, ‘ডি মাসনাহমে’, ‘ডি মুট্টের’, ‘সিমোন মাশার’, ‘আরতুরো উই’। বের্টোল্ট ব্রেখ্টের ‘এপিক থিয়েটার’ নাট্যাঙ্গিক নিয়ে সারা পৃথিবী আলোড়িত হয়েছে। পুঁজিবাদের ভয়াবহ বিকার ও অবক্ষয়কে বিশ্লেষণ করার জন্য ব্রেখ্ট মহাকাব্যকে আশ্রয় করেছেন। এই মহাকাব্যিক পদ্ধতি রপ্ত করার জন্য তিনি সংস্কৃত নাটক পড়েছেন। মার্কিস বুঝেছেন, চিনের পিকিং অপেরার কাছে গেছেন, জাপানের কাবুকি দেখেছেন।

**মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬) :** জন্ম অবিভক্ত ভারতবর্ষের ঢাকায়। পিতা কবি, সাহিত্যিক, প্রাক্তন ‘বর্তিকা’ সম্পাদক মণীশ ঘটক, কল্লোল যুগের ‘যুবনাশ’। মাতা ধরিত্বী দেবী। মহাশ্বেতার শিক্ষাজীবন কেটেছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। দেশভাগের পর এপার বাংলায় চলে আসেন। বিশ্বভারতী থেকে ইংরেজিতে স্নাতক হন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোন্তর ডিপ্লি লাভ করেন। অভিনেতা, নাট্যকার, লেখক, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অন্যতম পুরোধা বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহ ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭।

মহাশ্বেতা দেবীর বিচ্ছিন্ন কর্মজীবনের শুরু স্কুল শিক্ষকতা দিয়ে। পরে কিছু দিনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি। শেষপর্যন্ত বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে ইংরেজির অধ্যাপকরূপে স্নেহচায় শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ। মহাশ্বেতা দেবীর প্রথম মুদ্রিত লেখা রবীন্দ্রনাথের ‘ছেলেবেলা’ প্রন্থটি নিয়ে। যৌটি ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় খণ্ডনাথ সেন সম্পাদিত ‘রংমশাল’ পত্রিকায়। প্রথম মুদ্রিত প্রন্থ ‘ঝঁসীর রাণী’ সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম উপন্যাস ‘নটী’ হুমায়ুন কবীর সম্পাদিত ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে।

গল্প, উপন্যাস, অনুবাদ, জীবনী ইত্যাদি মিলে মহাশ্বেতা দেবীর বইয়ের সংখ্যা শাতাধিক। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল: অরণ্যের অধিকার, কবি বন্দ্যঘটী গাঁওঁর জীবন ও মৃত্যু, অক্লান্ত কোরব, চোটি মুংগা ও তার তীর, তিতুমির, শ্রীশ্রীগণেশ মহিমা, হাজার চুরাশির মা ইত্যাদি। মহাশ্বেতা দেবী শুধু লেখালেখিতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। মানুষের লড়াইয়ে শামিল হয়েছেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁর লেখাকে জীবনের স্বাদে ভরপুর করে তোলে। জীবনে বহু পুরস্কার ও সম্মান তিনি অর্জন করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত লীলা পুরস্কার, শরৎচন্দ্র স্মৃতি পদক; ভূবনমোহিনী পদক; জগতারিণী স্বর্ণপদক; অমৃত পুরস্কার; সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (১৯৭৯); ভারত সরকার প্রদত্ত ‘পদ্মশ্রী’ (আদিবাসী ক্ষেত্রে কাজের জন্য ১৯৮৬); জ্ঞানপীঠ পুরস্কার; ম্যাগসেসে পুরস্কার ইত্যাদি।

**মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) :** জন্ম সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহরে। পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুর, ঢাকা। প্রকৃত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক তাঁর ডাকনাম। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা নীরদা দেবী। পিতার চাকরিসূত্রে বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্কুলে তাঁর ছাত্রাবস্থা কেটেছে। পরে বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজ থেকে আই এস সি পাশ করে অঙ্গে অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এসসি. পড়ার সময় ‘অতসীমামী’ (বিচিত্রা ১৯২৮) গল্প লিখে বাংলা সাহিত্যে তাঁর সাড়া জাগানো পদার্পণ।

প্রথম জীবনের দু-চার বছরের চাকরি ছাড়া সাহিত্যরচনাই ছিল তাঁর একমাত্র কাজ।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘জননী’ প্রকাশিত হয়। তাঁর রচির অন্যতম প্রধান উপন্যাসগুলির মধ্যে ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ ও ‘পদ্মানন্দীর মাঝি’ ধারাবাহিকভাবে ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হলো: ‘দিবারাত্রির কাব্য’, ‘ইতিকথার পরের কথা’, ‘শহরবাসের ইতিকথা’, হলুদ নদী, সবুজ বন, ‘জননী’, ‘চিহ্ন’, ‘মাশুল’ ইত্যাদি। মোহ ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে এই উপন্যাসিকের গল্প লেখার ধরনটিও ছিল অনন্য। লিখেছেন তিনশোর বেশি গল্প। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল ‘অসতীমামী ও অন্যান্য গল্প’, ‘প্রাণ্গতিহাসিক’, ‘মিহি ও মোটা কাহিনী’, ‘সরীসৃপ’, ‘রৌ’, ‘সমুদ্রের স্বাদ’, ‘ভেজাল’, ‘হলুদপোড়া’, ‘আজ কাল পরশুর গল্প’, ‘পরিস্থিতি’, ‘খতিয়ান’, ‘ছোটবড়’, ‘মাটির মাশুল’, ‘ছোট বকুলপুরের যাত্রী’, ‘ফেরিওয়ালা’ ‘লাজুকলতা’ প্রভৃতি। ‘লেখকের কথা’ (১৯৫৭) তাঁর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন।

**মৃদুল দাশগুপ্ত :** জন্ম ৩ এপ্রিল ১৯৫০, শ্রীরামপুরে। পিতা জ্যোৎস্না কুমার দাশগুপ্ত ও মাতা সাম্ভনা দাশগুপ্ত। প্রথমে পূর্ণচন্দ্র বিদ্যালয় ও পরে শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইন্সটিউটে শিক্ষালাভ। এরপর উত্তরপাড়ার প্যারামীমোহন কলেজ থেকে জীবনবিজ্ঞানের স্নাতক। কলেজ জীবনেই কবিতা লেখা শুরু।

কিছুদিন শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইন্সটিউটে শিক্ষকতা করবার পর ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে পাকাপাকিভাবে সাংবাদিকতা শুরু করেন। প্রথমে ‘পরিবর্তন’ সাপ্তাহিক এবং তারপর ‘যুগান্তর’ পত্রিকায়। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ‘আজকাল’ পত্রিকায় যোগ দেন। এখনও সেই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

কবি মৃদুল দাশগুপ্ত ‘বাইসন’ ও ‘শত জলবর্ণার ধ্বনি’ নামে দুটি লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘জলপাই কাঠের এসরাজ’। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—‘এভাবে কাঁদে না’, ‘গোপনে হিংসার কথা বলি’, ‘সূর্যাস্তে নির্মিত গহ’, ‘সোনার বুদ্ধদ’। সংকলিত কবিতাটি ‘ধানক্ষেত থেকে’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

‘কবিতার সহায়’ ও ‘সাত-পাঁচ’ নামে দুটি সদ্য সংগ্রহও প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া আছে ছড়ার বই ‘আমপাতা’ জামপাতা’, ‘ছড়া পঞ্চাশ’ ও ‘রঙিন ছড়া’।

তিনি ন্যাশনাল রাইটার্স অ্যাওয়ার্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কার ও রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) :** জন্ম জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথের পড়াশোনা চলত ঘরেই, মাধব পাঞ্জিরে কাছে। প্রথম স্কুল ওরিয়েন্টাল সেমিনারি। তারপর বেঙ্গল একাডেমি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল। কিন্তু স্কুলের পাঠ শেষ করতে পারেননি। স্কুলে প্রথাগত শিক্ষা না হলেও বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে জ্ঞানার্জনে কোনো ত্রুটি ঘটেনি। ছাপার অক্ষরে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা ‘হিন্দু মেলার উপহার’ (৩০ মাঘ ১২৮১)। কবির বয়স তখন ১৩ বছর ৮ মাস। ১৮ বছর বয়সের মধ্যে কবি ‘বনফুল’, ‘কবিকান্তী’, ‘ভানুসিংহের পদাবলী’, ‘শৈশব সংগীত’ ও ‘বুদ্ধচণ্ড’ রচনা করেন। ‘জ্ঞানাঙ্কুর’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘ভূবনমোহিনী প্রতিভা’ তাঁর প্রথম গদ্য প্রবন্ধ। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ পিতার আদেশে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারি দেখতে গিয়ে প্রকৃতির সুন্দর পরিবেশ তাঁকে রচনায় অনুপ্রাণিত করে।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ড যান। এই সময় বিখ্যাত ইংরেজ শিল্পী রোডেনস্টাইন কবির ইংরেজি অনুবাদে কাব্যসংকলন ‘গীতাঞ্জলি’ (Song Offerings) পাঠ করে মুগ্ধ হন। এই গ্রন্থের জন্যই তিনি ১৩১৩-য় নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন। তিনিই প্রথম নোবেলজয়ী ভারতীয়। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সুরকার, নাট্যপ্রযোজক, চিত্রকর ও স্বদেশপ্রেমিক। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের (ভারত ও বাংলাদেশ) জাতীয় সংগীতের রচয়িতা তিনি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আছে ‘মানসী’, ‘সোনার তরী’, ‘চিত্রা’, ‘বলাকা’, ‘পুরবী’, ‘মহুয়া’, ‘আকাশপদ্মীপ’, ‘নবজাতক’, ‘রোগশয়ার’, ‘আরোগ্য’ ইত্যাদি। উপন্যাসের মধ্যে ‘নৌকাডুবি’, ‘গোরা’, ‘যোগাযোগ’, ‘ঘরে-বাইরে’, ‘চতুরঙ্গ’, ‘চার অধ্যায়’, ‘শেষের কবিতা’ ইত্যাদি। নাটকের মধ্যে ‘রাজা ও রাণী’, ‘বিসর্জন’, ‘রাজা’, ‘ডাকঘর’, ‘মালিনী’, ‘অরূপরাতন’, ‘রক্তকরবী’ ইত্যাদি। এছাড়া আছে অসংখ্য প্রবন্ধ, ন্যাট্যনাট্য, গল্প, চিঠিপত্র, স্মৃতিকথা ইত্যাদি।

**শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৯৫) :** জীবনানন্দ পরবর্তীকালে অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি। জন্মস্থান বহু-দক্ষিণ চৱিশ পরগনা। কলকাতার কাশিমবাজার স্কুল থেকে পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। পরে কবি বুদ্ধদেব বসুর আমন্ত্রণে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্যগঠিত তুলনামূলক সাহিত্যে ভরতি হলেও কয়েকমাস পড়ে তা ছেড়ে

দেন। তৎকালীন ‘ক্ল্যারিয়ন’ বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে কপিরাইটার হিসেবে তাঁর প্রথম চাকরি। এরপর ‘ভারবি’ প্রকাশনায়, যেখানে তাঁরই পরিকল্পনায় ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’-র সিরিজ প্রকাশিত হতে থাকে। এই সময়ে বন্ধু পৃথিবী গঙ্গেপাখ্যায়ের সহযোগিতায় একটি টিউটোরিয়াল হোমও খোলেন। সে সময়ের তরুণ কবিদের একমাত্র মুখ্যপত্র ‘কৃতিবাস’ পত্রিকায় তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান প্রতিভা। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ‘কবিতা’ পত্রিকায় ‘যম’ কবিতা লিখে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘কুয়োতলা’ প্রকাশিত হয় যাতে তিনি তাঁর স্বগ্রামের উপভাষা ব্যবহার করেছিলেন। এর আগে তাঁর ছোটোগল্প ‘নিরূপমের দুঃখ’ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অপর দুই উপন্যাস ‘দাঁড়ার জায়গা’ ও ‘অবনী বাড়ি আছো?’ একসময়ে ‘বৃপচাঁদ পক্ষী’ ছদ্মনামে কলকাতা নিয়ে নিয়মিত ফিচার লিখেছেন। পরবর্তীকালে সম্পাদনা করেছেন ‘কবিতা সাপ্তাহিকী’। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৫১। প্রগৌত-অনুদিত-সম্পাদিত কবিতা ও গদ্যগ্রন্থের সংখ্যা ১১১। তাছাড়া অজস্র অগ্রন্থিত রচনা নানান পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে। অনুবাদ করেছেন ‘মেঘদূত’, ওমর খৈয়াম, গালিব, লোরকা, রিলকে প্রমুখের কবিতা। ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো’ কাব্যগ্রন্থের জন্য পেয়েছিলেন সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে। এছাড়াও তিনি আনন্দ পুরস্কার, সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গঙ্গাধর মেহের পুরস্কার, মরণোন্তর রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : ‘সোনার মাছি খুন করেছি’, ‘হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান’, ‘ধর্মেও আছো জিরাফেও আছো’, ‘ছিন্নবিচ্ছিন্ন’, ‘প্রভু নষ্ট হয়ে যাই’, ‘পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি’ প্রভৃতি। বিশ্বভারতীতে অতিথি-অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনায় রাত থাকাকালীন তিনি আকস্মিকভাবে প্রয়াত হন।

**শত্রু মিত্র (১৯১৫-১৯৯৭) :** জন্ম কলকাতার ডোভার রোডে। বাবা শরৎকুমার মিত্র, মা শতদলবাসিনী দেবী। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে পড়াশোনা। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভরতি হন। অভিনয়ের পাঠ নেন কৃষ্ণগোবিন্দ সরকারের কাছে। পেশাদার মঞ্চ রঙমহলে অভিনয় করেছেন ‘মাটির ঘর’, ‘ঘূর্ণি’, ‘রত্নীপ’ নাটকে। ১৯৪১-এ যোগ দেন মিনাৰ্তা থিয়েটারে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির আৱৰ্গম মঞ্জে ‘জীবনৰঞ্জ’, ‘উড়ো চিঠি’-সহ পাঁচটি নাটকে অভিনয় করেন। ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের সময় রচনা করেন ‘উলুখাগড়া’ নাটক। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক-শিল্পী সংঘের সঙ্গে যুক্ত হন। নবগঠিত ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বাংলা শাখার নাট্য সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৪-এর তৃতীয় জানুয়ারি স্টার থিয়েটারে বিজন ভট্টাচার্যের ‘জবানবন্দী’ নাটকের পরিচালনা। শ্রীরঙ্গম মঞ্জে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ‘নবান্ন’ প্রথম অভিনীত হয়। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন, অভিনয়ও করেন। খাজা আহমেদ আবাসের ‘ধরতি কে লাল’-এর সহকারী পরিচালক। অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্রের সঙ্গে বিয়ে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল হয় ১৯৪৭-এ। ১৯৫০-এর ১-লা মে, বহুবৃপ্তী নাট্যদলের প্রতিষ্ঠা। নাট্যপরিচালক পদে শত্রু মিত্র। বহুবৃপ্তী প্রযোজিত প্রথম নাটক ‘উলুখাগড়া’। দ্বিতীয় নাটক ‘বিভাব’ জাপানি কাবুকি নাটকের অভিনব বৃপাস্তর। রচনা ও পরিচালনা শত্রু মিত্র। এরপর বহুবৃপ্তীর প্রযোজনায় একে একে মঞ্চস্থ হতে থাকে অবিস্মরণীয় নাটক, যা বাংলা নাটকচর্চাকে ঐতিহাসিক উচ্চতায় নিয়ে যায়। চার অধ্যায়, দশচক্র, যেমন, রক্তকরবী, ডাকঘর, পুতুল খেলা, মুক্তধারা, বিসর্জন, রাজা অয়দিপাট্টস, রাজা, বাকি ইতিহাস, বর্বর বাঁশী ইত্যাদি। নাটক লেখা বা বৃপাস্তর, অভিনয় বা নির্দেশনা—কোনো-না-কোনোভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন শত্রু মিত্র। বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান প্রবক্তা। নাটক নিয়ে এই নিশ্চিদ্ব ব্যস্ততার মধ্যেই তিনি বহু চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন, সহকারীর দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বনামে ও ছদ্মনামে লিখেছেন প্রবন্ধ, গল্প। সম্মানিত হয়েছেন সংগীত-নাটক আকাদেমি, ম্যাগসাইসাই, কলিদাস ইত্যাদি পুরস্কারে।

**সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭) :** জন্ম কলকাতার বাগবাজারে বিশ্বকোষ লেন-এর বাড়িতে। আদি নিবাস ঢাকা মানিকগঞ্জ, সুয়াপুর। পিতা অরুণচন্দ্র সেন। মাতা চন্দ্রমুখী দেবী ছিলেন বঙ্গিকম-বাঞ্চির জগদীশনাথ রায়ের দোহিত্রী। পিতামহ দীনেশচন্দ্র সেন ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখক ও ইতিহাস-প্রণেতা। সমর সেন পড়াশোনা করেছেন কাশিমবাজার পলিটেকনিক স্কুল, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এম. এ. ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। কর্মজীবনের প্রথমে দু মাস কাঁথির প্রভাতকুমার কলেজে অধ্যাপনা করেন। দিল্লির অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো-য় কয়েক বছর নিউজ এডিটর হিসেবে কাজ করেছেন। তিনের দশকে কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর কবিতার বিষয় ও রীতির বিশিষ্টতা বিদ্যুৎজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ত্রৈমাসিক ‘কবিতা’ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক (১৯৩৪) খ্যাতির শীর্ষে থাকার সময় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে হঠাৎই কবিতা লেখা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। নতুন কাব্যরীতি ও রোমান্টিকতাবর্জিত তীক্ষ্ণ ভাষাথর্যোগ সমর সেনের কবিতাকে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত করেছে। তাঁর কবিতা গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে ‘গ্রহণ’, ‘নানাকথা’, ‘খোলা চিঠি’, ‘তিন পুরুষ’। ‘সমর সেনের কবিতা’ প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর কবিজীবন বিষয়ের গভীরতা ও বিস্তৃতিতে, প্রকাশগত তর্ফকার্য, তীব্র নগরচেতনায় ও নাগরিক দার্শনিকতায় অভিনব। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘বাবু বৃত্তান্ত’ ১৯৭৮-এ প্রকাশিত হয়। পরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সম্পাদকরূপে নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তোলেন।

**সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২) :** জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাসপুরে। ১৯৪৬-এ বর্ধমান জেলার গোপালপুর মুস্তকেশী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। স্নাতক হন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে। ছোটোবেলা থেকেই ছিল তাঁর বই পড়ার নেশা। ১৯৫০ সালে ‘ইবলিশ’ ছদ্মনামে প্রথম গল্প ‘কাঁচি’ প্রকাশিত হয় বহরমপুরের ‘সুপ্রভাত’ পত্রিকায়। ওই সালেই সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকায় ‘শেষ অভিসার’ কবিতা বেরোয়। ১৯৬২ সালে সাপ্তাহিক ‘দেশ’-এ প্রথম প্রকাশিত গল্প ‘ভালোবাসা ও ডাউন ট্রেন’। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের ‘ভাঙ্গা’ পত্রিকায় কাজ করেন ১৯৬৪-১৯৬৯। ‘আনন্দবাজার’ পত্রিকার বার্তা বিভাগে স্থায়ী চাকরিতে যোগ দেন ১৯৭১ সালে। প্রায় পাঁচিশ বছর তিনি এই পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস ‘নীল ঘরের নটী’ প্রকাশিত হয়, ১৯৬৬ সালে। সর্বস্তরের পাঠকের অভিনন্দন-ধ্য এই উপন্যাস। প্রকাশিত প্রস্তুত সংখ্যা উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ মিলিয়ে দুশো-র বেশি। ছোটোদের জন্য তাঁর লেখা রহস্য কাহিনির নায়ক প্রকৃতিবিজ্ঞানী কর্নেল নীলান্দ্রি সরকার অত্যন্ত জনপ্রিয় চরিত্র। সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের জন্য ‘আনন্দ পুরস্কারে’ সম্মানিত হন ১৯৭৯ সালে। ‘অলীক মানুষ’ উপন্যাসের জন্য ‘সাহিত্য অকাদেমি’, ভূয়ালকা পুরস্কার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘বঙ্গিম পুরস্কার’ পান। ২০১০-এ পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার’। ‘অমর্ত্য প্রেমকথা’র জন্য তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহ দাস স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়াও তিনি সামগ্রিক সাহিত্যকৃতির জন্য পেয়েছেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুরস্কার, শরৎচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার। শৈলজানন্দ জন্ম শতবার্ষিকীতে পেয়েছেন শৈলজানন্দ স্মৃতি পুরস্কার। ১৯৮০ সালে তিনি আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে চার মাস আমেরিকায় ছিলেন। লেখা ও পড়ায় সমান নিষ্ঠা ছিল সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের। কথাসাহিত্যের সঙ্গে বেশ কিছু প্রবন্ধও লিখেছেন তিনি। অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের মনোজ্ঞ মিশেন তাঁর রচনাবলি। ‘হিজলকন্যা’, ‘নিশিমুগয়া’, ‘মায়ামৃদঙ্গা’, ‘স্রোতে ভেসে আছি’ ইত্যাদি তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রস্থ। তাঁর লেখা বিখ্যাত ছোটগল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ‘পদ্মবনে মন্ত হাতি’, ‘সাপ বিষয়ে একটি উপাখ্যান’, ‘মৃত্যুর ঘোড়া’, ‘কালুহাটির বৃত্তান্ত’, ‘বসন্তের বিকেলে ঘুমঘুমির মাঠে’, ‘সুর্যমুখী’, ‘ভারতবর্ষ’, ‘উড়ো পাথীর ছায়া’, ‘আত্মজ’, ‘বাদশা’ প্রভৃতি।

